SRI SRI DURGA PUJA

Pujari Atlanta

October 12 & 13 1991

৺মা দুর্গার আবাহনে

পূজারী

১২–১৩ অক্টোবর ১৯৯১
২৫–২৬ আশ্বিন ১৩৯৮

শ্রীশ্রী দুর্গায়ৈ নমঃ

শ্রী শ্রী দুর্গা পূজা - ১৩৯৮

SRI SRI DURGA PUJA - 1991

দুর্গা পূজার অনুষ্ঠান সূচী:

শনিবার, ২৫শে আশ্বিন, ১৩৯৮
- পূজা বেলা দশটা
- অঞ্জলি বেলা বারোটা
- প্রসাদ বেলা একটা
- বিচিত্রানুষ্ঠান বিকেল সাড়ে চারটে
  - বাংলা নাটক:
  - "কাঞ্চনরঙ্গ"
- সন্ধ্যারতি রাত্রি আটটা
- প্রসাদ রাত্রি ন'টা

রবিবার, ২৬শে আশ্বিন, ১৩৯৮
- পূজা বেলা দশটা
- অঞ্জলি বেলা বারোটা
- প্রসাদ বেলা একটা

1991 Durga Puja Program:

Saturday, October 12, 1991
- Puja 10 am
- Anjali 12 noon
- Prosad 1 pm
- Entertainment 4:30 pm
  - Bengali Play:
  - "Kanchanranga"
- Arati 8 pm
- Prosad 9 pm

Sunday, October 13, 1991
- Puja 10 am
- Anjali 12 noon
- Prosad 1 pm

Pujari Durga Puja
Brochure - 1991

পূজারীর দুর্গা পূজা
পুস্তিকা - ১৩৯৮

Editors:
Samar Mitra
Jayanti Lahiri
Suzanne Sen
Amitava Sen

সম্পাদক:
সমর মিত্র
জয়ন্তী লাহিড়ী
সুজ্যান সেন
অমিতাভ সেন

Computer Typing,
Cover, and Brochure Design:
Amitava Sen

কম্পিউটার মুদ্রণ,
প্রচ্ছদ, এবং পুস্তিকা ডিজাইন্:
অমিতাভ সেন

Computer Software & Fonts:
Printed using "Sampadak"
Multilingual Word Processor
written & published by
Amitava Sen; and miscellaneous
scanning, graphics, and word
processing software.

কম্পিউটার সফ্টওয়ার ও লিপি:
অমিতাভ সেন রচিত "সম্পাদক"
বহুভাষী ওয়ার্ড প্রসেসর দ্বারা মুদ্রিত।
এ ছাড়া বিবিধ স্ক্যান, গ্রাফিক্স, ও ওয়ার্ড
প্রসেসর সফ্টওয়ার ব্যবহার করা হয়েছে।

Production:
Amitava Sen
Asok Basu

উৎপাদন:
অমিতাভ সেন
অশোক বসু

Published by:
Pujari
4515 Holliston Road
Doraville, Georgia 30360

tel: (404) 451-8587

প্রকাশনা:
পূজারী

সূচীপত্র
Contents

রচনা (Articles)

Samar Mitra - রোগান্ অশেষান্ অপহংসি তুষ্টা 4

Shyamoli Das - India's awakening 6

Mamata Banerjee - 'Extra-Indianization' of the Indian-American community 8

Pranab Lahiri - A lesson in etiquette in three countries 10

Suzanne Sen - How are you? - a recommendation 11

Ian Watt - Want to send a parcel to Belgium? 12

কবিতা (Poetry)

Yasho Lahiri - Time and pride wait for no one 14

All is forgiven 15

Lali Watt - Sunday snapshot 15

Ratna Das - শক্তি-শরণ, উপলব্ধি 16

Susmita Mahalanobis - ফুল 17

Bijan Prasun Das - বিবর্তন 18

Sutapa Das - স্বপ্নবিলাস 18

Md. Musharatul Huq Akmal - ভাল লাগে 19

Amitava Sen - প্রেরণা, Brainwave 19

গল্প (Stories)

Kalpana Das - ছন্দছাড়া 20

Krishna Ray - উৎসব 21

Apurba Ray - চৈতালি 22

Somnath Misra - চার আনা 24

Harsha Mukherjee - ভূত 27

Rekha Mitra - হঠাৎ দেখা 31

Amitava Sen - Ganesha - or why I wanted to be the lion 35

অঙ্কন (Drawings)

Shyamoli Das 6, 7

Susmita Mahalanobis 17

Amitava Sen 1, 30, 40, 47

Rekha Mitra 1, 16, 34

Suzanne & Amitava Sen 38

Mimi Sarkar 45

ছোটদের থেকে (From the younger set)

Marjorie Sen - drawings and poem (in French) 39

Atasi Das - The Magic Key (story) 40

Anirban Das - January (poem) 41

Rahul Basu - drawing 41

Pia Basu - drawing 42

Priyanka Mahalanobis - drawing 43

Sandip Mitra - A Prayer (and drawings) 44

বিবিধ (Miscellaneous)

Entertainment program 46

Special thanks - Statement of accounts 48

রোগান্ অশেষান্ অপহংসি তুষ্টা

সমর মিত্র

চণ্ডীতে শুম্ভ নিশুম্ভ হত হবার পর দেবতাদের কয়েকটা মনোজ্ঞ স্তোত্রের মাধ্যমে দেবীর স্তুতির কাহিনী পাওয়া যায়। শুম্ভ ও নিশুম্ভ পরাক্রমশালী দুই দৈত্য। রূপকের অবলম্বনে এদের নামকরণ। সাধনার পথে দুটি অন্তরায় হল এই শুম্ভ আর নিশুম্ভ। শুম্ভ হল অহংভাব অর্থাৎ আমিত্ব। নিজেকে কর্ত্তা বলে মনে করার অহঙ্কার। এই অহঙ্কার মানুষের দৃষ্টিকে অস্বচ্ছ করে দেয়, বিমূঢ় করে ফেলে। তাই গীতায় একটি শ্লোকের (৩:২৭) দ্বিতীয় চরণে শ্রীভগবান বলেছেন অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহম্ ইতি মন্যতে। তেমনি নিশুম্ভ হল মম বা আমার প্রতীক। এটা আমার, ওটা আমার, এগুলো আমার আছে, ওগুলো আমার হবে - এর মধ্যে তোমার বলে কিছুই নেই। এই আমি আর আমার মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতম, তাই শুম্ভ আর নিশুম্ভকে দুটি ভাই বলে পরিচয় দিয়েছেন চণ্ডীর রচয়িতা মার্কণ্ডেয় মুনি। অহং আর মম এই দুটি মহাশত্রুকে নানাভাবে চিনিয়ে দেবার প্রচেষ্টা করেছেন আমাদের শাস্ত্রকারেরা। ভাগবতের একটি শ্লোকের (২:৫:১৩) শেষার্দ্ধ 'বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহম্ ইতি দুর্দ্ধিয়ঃ'। দুর্বুদ্ধি দ্বারা মোহিত যারা তারাই আমি আর আমার বলে বড়াই করে। এই দুর্বুদ্ধিকে পুরুষকারের দ্বারা জয় করা হয়তো যায়, কিন্তু সে বড়ো কঠিন। চণ্ডীর সাধক সহজ উপায় অবলম্বন করেছেন দেবীর কৃপা ভিক্ষা করে। সদয় হয়ে দেবী এই অহং আর মম নাশ করেছেন - সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়েছে সাধকের জগৎবুদ্ধি আর দৃষ্টিশক্তি। কৃতজ্ঞতায় ভরে গেছে মন, তারই প্রকাশ স্বতোৎসারিত কয়েকটি স্তোত্রে যার মধ্যে একটির সূচনা, 'রোগান্ অশেষান্ অপহংসি তুষ্টা'।

রূপকের অবলম্বন করে দেবতাদের দিয়ে বলাচ্ছেন ঋষি। দেবতারা হলেন দিব্য শক্তি। সাধকের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় এরা। একটু ভাবলেই বোঝা যায় ইন্দ্রিয়শালী আমরা এই ইন্দ্রিয়দের সম্বন্ধে সামান্যই সচেতন। দেখতে পাওয়া, শুনতে পাওয়া ইত্যাদি যে দিব্য শক্তি তা আমরা এদের না হারানো পর্যন্ত বুঝতে পারি না। এই অজ্ঞান হল বিশেষ একটি রোগ - যেমন দেহের রোগ, মনের রোগ, এ হল বুদ্ধির রোগ - ভবরোগ। এই ভবরোগ হল অশেষ রোগ - দেহ মনের রোগের আরম্ভ আর শেষ আছে। ভবরোগের আরম্ভ নেই, ঐ রোগ নিয়েই আমাদের জন্ম, এর শেষও নেই। তবে একেবারে শেষ নেই তা নয়, শেষ হয় দৈবী কৃপায়। তাই সাধক বলছেন 'রোগানশেষান্ অপহংসি তুষ্টা' - তুষ্টা হলে রোগমুক্ত কর মা অশেষ।

কিন্তু মায়ের তো শুধু তুষ্টা রূপ নয়। অসুর দানব দলনী রুষ্টা রূপও তাঁর। শুম্ভ আর নিশুম্ভ - অহং আর মম দিয়ে আমাদের কামনা বাসনায় ঘেরা সংসার। কামনা হল বর্ত্তমান বা আসন্ন কালের বিষয়েচ্ছা আর বাসনা হল ভবিষ্যতের। এই দুইয়ের খেলায় মত্ত হয়ে এদের অতীত যে ভূমার আনন্দ তার

সন্ধান করে কজন? মুষ্টিমেয় যারা বা সুরু করে, তাদের বিরুদ্ধেই এই দুটি দানবের শক্তির পরিমাণ প্রকাশ পায়। যেমন শিশু বা দুর্বল ব্যক্তিকে আয়ত্তে রাখতে মল্লবীরের শক্তি প্রয়োগ করতে হয় না, করতে হয় প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে, ঠিক তেমনিই এই অহং আর মমরূপী দানবের প্রকোপ প্রকাশ পায় সাধনার স্তরে স্তরে। এদের নির্মূলকারিণী মায়ের মূর্ত্তি সাধকের কল্পনায় তাই রুদ্ররূপা হয়ে ধরা দিয়েছে। কামনা বাসনার বস্তুর বিনাশের প্রাথমিক অনুভূতি কষ্টকর সেজন্যে মাকে রুষ্টা বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক, তাই ঋষি বলছেন 'রুষ্টাত্ব কামান সকলান্ অভীষ্টান্' অর্থাৎ কামনা অভীষ্ট রুষ্টা হলে নাশ হয়।

কিন্তু যিনি সর্বতোভাবে মায়ের শরণ নিয়েছেন, পেয়েছেন মায়ের অভয় আশ্রয় তিনি বুঝতে পারেন মায়ের এই রোষপ্রকাশের অন্তরালে রয়েছে সাধকের কল্যাণ সাধন। তাঁর আশ্রিতদের বিপদ বলে কিছু থাকতে পারেনা। বিপদ বলতে বোঝায় সম্পদের বিনাশ। এই বিপদ আর এর বিপরীত সম্পদের প্রচলিত সংজ্ঞা, শাস্ত্রে উল্লিখিত সংজ্ঞার একেবারে বিপরীত। শাস্ত্র বলেছেন যাকে আমরা সাধারণত বিপদ বলে মনে করি তা প্রকৃত বিপদ নয়, তেমনি যে সম্পদের পেছনে আমরা ছুটে বেড়াই তাও প্রকৃত সম্পদ নয়, প্রকৃত বিপদ হচ্ছে সেই পরমকে ভুলে থাকা – যে অবস্থার মানুষদের ঈশোপনিষদের ঋষি 'আত্মহনো জনাঃ' বলেছেন। তেমনি প্রকৃত সম্পদশালী হলেন তাঁরা, ইষ্টের স্মৃতি যাঁদের মনের গহনে সর্বদা ভাস্বর হয়ে থাকে। এঁরাই তাঁর আশ্রিতপদবাচ্য, এঁরাই সর্ববিপদ থেকে মুক্ত। আশার কথা এই আশ্রিতরা শুধু নিজেরাই বিপন্মুক্ত হননি, অন্যদের বিপদ থেকে মুক্ত করার চাবিকাঠিও হাতে পেয়েছেন। এঁদের কামনা বলে যেটুকু থেকে যায় সে হল জগতের কল্যাণ সাধন। বিপদ আর সম্পদের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করে সেই পরমের সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন যাঁরা এঁদের কাছেই তাঁরা পাবেন পথের নিশানা। এঁদের আশ্রয় পৌঁছে দেবে সেই পরমের কাছে, পাইয়ে দেবে পরম আশ্রয়। ঋষি তাই বলেছেন "ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং, ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি" অর্থাৎ তোমার আশ্রিতদের বিপদের লেশ থাকে না, আর তারাই হয় অন্যের আশ্রয়।

সম্পূর্ণ শ্লোকটি (চণ্ডী ১১:২৮)

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা রুষ্টা ত্ব
কামান্ সকলান্ অভীষ্টান্
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং ত্বামাশ্রিতা
হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি

বাংলা অনুবাদে–

'তুষ্টা হলে রোগমুক্ত কর মা অশেষ
কামনা অভীষ্ট রুষ্টা হলে নাশ হয়
তোমার আশ্রিতদের বিপদের লেশ
থাকে না তারাই হয় অন্যের আশ্রয়'

জয় মা –

সমর মিত্র

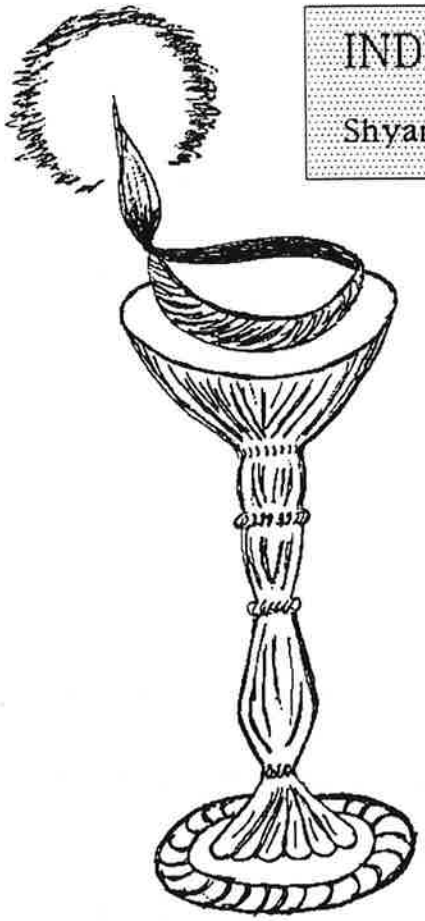

INDIA'S AWAKENING

Shyamoli Das

It was in 1897 that Swami Vivekananda told the people: "For the next fifty years let mother India be your God. Serve your country as you would serve God, and India will awaken!"

From 1897 to 1947 is exactly fifty years. Fifty years after Swamiji spoke those words India achieved independence from British rule. It was the first great step of the awakening Swamiji had described. Without political independence the national awakening could not come, for freedom is essential to growth and development.

Swamiji said that political ideals and political leaders have no real power in India, nor have social or commercial ideals. The only ideal that has real and lasting power in India is the ideal that is based on inner strength. It is a spiritual ideal that says that the soul of man is more powerful than anything else. That is India's national ideal, and when she puts this ideal into practice in her daily life, she will be strong and powerful.

If it is true that the soul of man is more powerful than anything else, then this ideal is true for all people everywhere. So Swamiji said that Indians should now go out into the world and mix with other nations and tell them about this great ideal.

When Indians do that, then will come the awakening of India that Swamiji spoke about. Using the great power that lies in the soul of men, India will spread peacefully throughout the world the equality and justice and sharing of benefits for which so many people are now fighting.

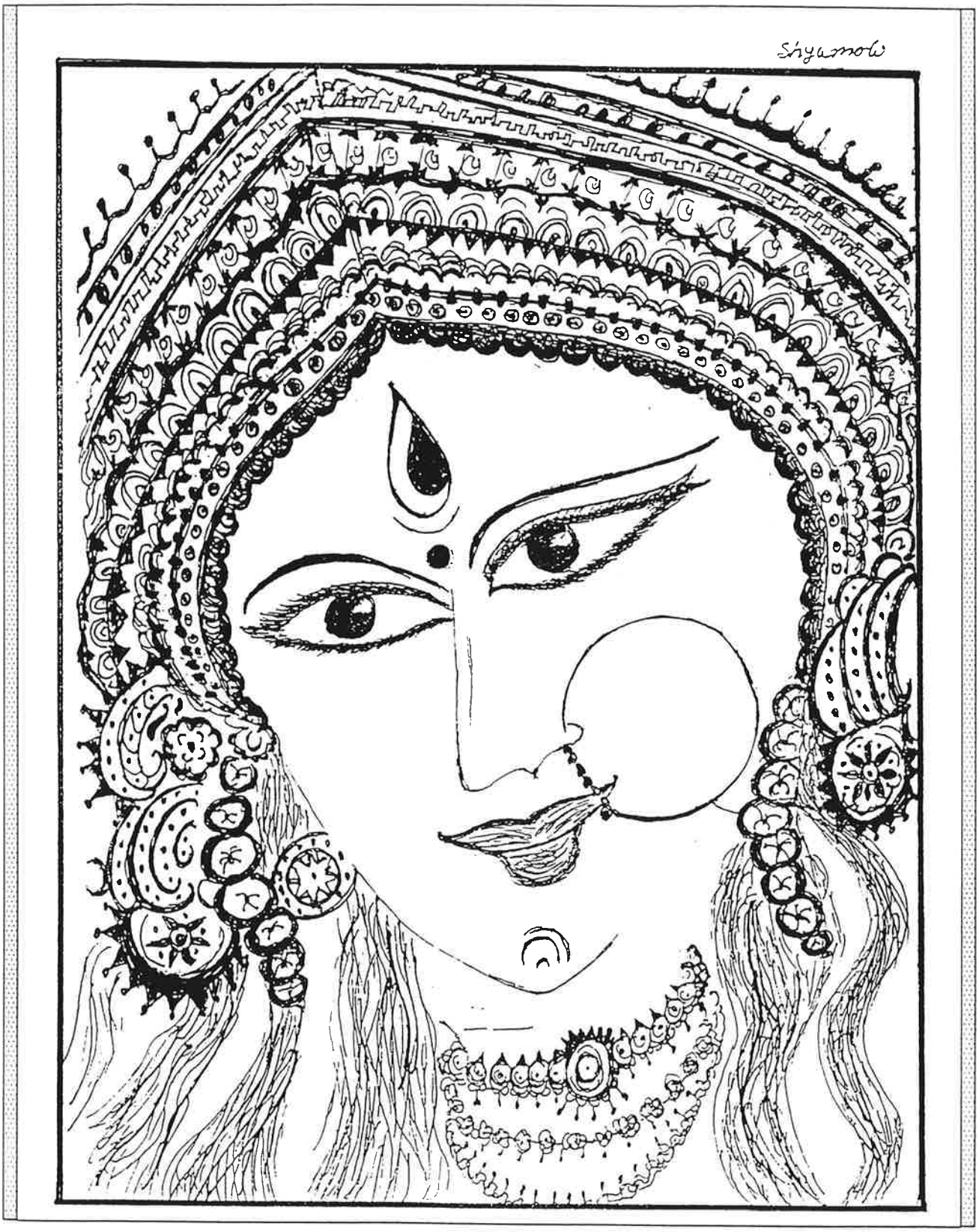
Shyamoli

'EXTRA-INDIANIZATION' OF THE INDIAN-AMERICAN COMMUNITY

Mamata Banerjee

One month back I got the chance to visit USA for the first time in my life. I came to stay with my daughter who is a graduate student at Georgia State University. I had earlier tried to visualize the US through her letters, but nothing had prepared me for the excitement of a live experience.

Since I was living in a student community, I had the chance to talk to many of them and also visit the houses of non-resident Indians. Through these experiences I tried to gain my own understanding of the society separate from the preconceived notions I already had formed. My idea of a free, permissive society dissolved as I realized how desperately Indians here were trying to cling on to their culture and values.

Among most of the non-resident Indians and majority of students, I noticed a trend of "extra-Indianization". In India, while traditional values are crumbling down and imitation of the West is gaining popularity, the Indians in USA are trying to cling on to their image of Indian values, which is almost a kind of dream to them.

Most of the Indians here are oblivious to the fact that values are changing very fast in India. Values are never static in nature, they change with the changing social structure, which in its turn is dependent on the system of production possessed by a particular society. India's transition from an agricultural to an industrialized society has resulted in a kind of vacuum, as far as the values are concerned. The same thing happened in England and Europe too, in the eighteenth and nineteenth centuries, but the problem in India is unique because of its diverse and heterogeneous social structure over-ridden by class and caste differences. Hence cherished Indian values like emphasis on spirituality, joint-family structure, non-materialism, etc., are fast losing ground, and are being replaced by Western values like individualism, materialism, etc. It was really impressive to see how many of the non-resident Indians are fervently trying to keep their traditional values intact by visiting the Vedantic Societies, attending meditation clubs, organizing cultural functions of a high order on the occasion of Durga Puja, etc. I think very few people in India today would like to spend their time in a similar fashion. For example, Vijaya Sammelanis in Calcutta (mostly organized by local clubs) have been converted into functions where Hindi film songs and pop music are the main source of attraction. On the occasion

of the immersion of the image, young boys in Calcutta are found dancing Disco and Break-dances on the streets. Hence it is not incorrect to say that there is very little mass participation in the cultural and religious activities going on in Calcutta today.

For the first generation Indians in USA, this clinging to Indian values is probably helping them a lot to resolve their identity crisis. But for the second generation, this might pose a serious problem. Extra-Indianization on the part of their parents might confuse them greatly. I have felt that only a proper synthesis between the Indian and American culture can save these children from a very precarious future. Fortunately, however, I have met some families who have been successful in evolving this approach.

As far as the student community is concerned, I had interactions with them through my daughter. We in India talk so much about the "brain-drain", and so I was interested to know whether these students, mostly representing the elite section of the Indian student community, would go back to their own country or not. Most of the students I talked to were skeptical about their job prospects in India, and barring a few exceptions (who can be termed as "idealists"), were interested in staying here. The Indian students that I met are probably the future NRI's of USA. I already found an important trend of "extra-Indianization" in them. As an important step towards this process, many of them prefer to bring their wives from India, whom they expect to have stronger roots in Indian culture and values. While in India, arranged marriages are increasingly becoming outdated and are replaced by love marriages and there is a growing preference for more educated and economically independent women, the students living in this free and permissive society are mostly preferring arranged marriages. Many of those I have met are eager to see their wives as housewives rather than equal partners. Hence, importing wives from India has become a predominant trend among students here.

In conclusion, I must admit that meeting so many talented individuals, both amongst the residents and also the students, within such a short span of time, has been really a great experience for me. I realized that all these individuals I met are busy pursuing the goal of self-development in a society which provides the best opportunity for this. But, I am not sure whether these individuals suffer from a sense of frustration, because through this process of self-realization, they are actually enriching a society to which they really do not belong. I wonder whether 'extra-Indianization' is an apology for this or not.

A LESSON IN ETIQUETTE IN THREE COUNTRIES

Pranab Lahiri

I am told that people are the same everywhere. That may be true for basic human emotions like joy, love, and hate, but when it comes to little things in life people of different cultures are very different. This was driven home to me by three little incidents in three countries.

While in Tanzania, I was driving to another town on business with Ben, my Tanzanian colleague. We were trying to get to a small town, but apparently he was not able to locate the road leading to this place and needed directions. After some time we saw a man walking by and I said, "Ben, why don't you ask this man?" Ben got out of the car and started a long conversation with him in Swahili. My knowledge of the language was limited, but I did understand that they were discussing about how much rain there was in the area, the state of the crops, how his children were doing, and so on. Finally after a long time Ben came to the point of asking how to get to our destination. Unfortunately the man did not know and the apology for his ignorance took another five minutes. We were on our way again. I asked Ben, "Did you know this man?" "No," said he. "Then why did you enter into such a long conversation with him? Couldn't you simply ask for directions?" "Oh, no! That would be most impolite - you can't do that abruptly. You have to lead very gently to the business." I learnt a lesson in African etiquette that day. When, however, we came across a second person, a group of persons actually, Ben got off the car and the whole process started all over again. This time, of course, we did get the directions we were looking for and the the process of thanking each other and offering each other greetings delayed us some more.

How about the American custom of asking "How are you doing?" This is done without any expectation of even getting any reply. Often if the two people are going in opposite directions one does not even slow down to get a reply, which of course is always "pretty good" or "fine" or something similar. Some time ago there was a very pleasant and charming young man whom I always saw in the office hallways and always exchanged the usual pleasantries. He was always doing "pretty good." When for a few days I did not see him, I enquired about him and learnt that he was into all kinds of trouble, had been fired, and that his wife also had left him. So much for being "pretty good."

Not long after this I visited Calcutta and ran into a person whom I had known for a long time. I politely asked him "How are you?" The next fifteen minutes were spent in getting a detailed account of all the various health problems he was having, all the various doctors that he had been to, all the medications he had been prescribed, along with the side effects some of them had caused. I was constantly trying to break out of this but to no avail. Finally when I could excuse myself I was so late for an appointment that I had to miss it that day and reshedule it for later. However I learnt a great lesson - when in Calcutta, never ask anybody "How are you?" unless you are dying to get a full report on his state of health.

HOW ARE YOU? - A RECOMMENDATION

Suzanne Sen

Americans have the habit of saying "How are you?" with no expectation of response. Is it a good habit? In the elevator the other day I was quite incensed to hear a man joking with his friend and saying, "Who is the most boring person? The one who answers the question when you say 'How are you?'!"

Perhaps it is because I work in a hospital, full of sick, worried, or hurting patients, or because I am sympathetic to the plight of the lonely or afflicted elderly, because of the various kinds of suffering and death I have seen this summer or because of the emphasis on politeness in my upbringing...whatever the reason, I have some recommendations for "turning over a new leaf."

Let's think of the other person. Let's think, rather than jabber out of habit: the hearer can be hurt if s/he knows we really could care less. Let's be sensitive to the needs of the hearer rather than irritated by them: many people would welcome the opportunity to talk to a friend, but find it embarrasing if they are approached, respond, and are rejected in the next breath.

Finally, let's think of ourselves! Let's take responsibility for what we say: if we don't want an answer, we don't need to ask the question. Let's get in the habit of substituting "Hello," "Good morning," "It's nice to see you," or some meaningful conversation! That would be more honest and more pleasant for both parties.

WANT TO SEND A PARCEL TO BELGIUM?

Ian Watt - Antwerp, Belgium

Have you ever considered what happens if you send a parcel to us in Belgium? It's not the simple "you send - they deliver - we receive" you might expect. In fact it is so much NOT simple that we have asked all our friends to refrain from sending anything larger than a regular letter to us. Here is what happens ...

A parcel is mailed to us from anywhere inside or outside Belgium. Since it is over the formal size and/or proportion of a regular letter (and therein lies another story) it is handed to the Belgian railways for delivery. No matter that you have written 'AIRMAIL' on both sides in large letters, the railways have a monopoly in ensuring delivery to you.

First, they register the parcel in their computer system and place it in their warehouse. Then, on the first day convenient to them, they schedule it onto a truck for delivery to your residence - between the hours of 10am - 12 noon and 2pm - 4:30pm. If, as with most people who work, you are not at home, they leave you a little note, in Flemish, which says that they attempted to deliver a package to you and will again attempt tomorrow. Further that if you would like any other arrangement made, could you please visit their office before 4:30pm. This is considerate of them but since you arrive home about 5:30pm, it's completely useless. So you know they will again attempt delivery next day, and that will fail. Sure enough, another little note appears in your mailbox saying that you have now used up your two chances at delivery and you'll have to collect it yourself from their offices between the hours of 10am - 12 noon or 2pm - 4:30pm. Ho hum! Now bear in mind that the parcel was first "delivered" to you on day D, and we are on day D+1. That first little note, in very small print, said that if the parcel was not collected by day D+7, it would be returned; no ifs, ands, or buts. So you reschedule your work, clients, meetings, whatever, and arrange to visit their offices.

They are, naturally, highly inaccessible, in the very north of Antwerp. They are beside a major road and while their is ample parking for their employees, there is no provision made for visitors. So you park illegally and enter. The building is in the turn-of-the-century official style: high ceilings, moldings, fake marble, echoing floors, everything a little scuffed and worn. Mostly you notice the row of dead or dying plants

arrayed on the flight of steps up to the reception area. It is unclear if they are there for beautification or for imminent disposal, but you weave your way between them and arrive at the main office area. There, the smells are from childhood. The indefinable flavor in the air caused by the continual rubbing of paper against paper; the slight stale air of a crowded office mixed with pencil shavings and decaying tea cups.

Having attracted the attention of one of the lackadaisical gentlemen behind the counter, you hand over your two slips. He goes to a large file and pulls from it your computer generated 'parcel record'. He scribbles on it, stamps it with aplomb, and directs you to the 'Kassa' - Cash Desk. There, behind bars, another gentleman charges you some minimal sum (normally about 5 Belgian Francs, or 15 cents), scribbles on your paper again, stamps it again, and issues you another bit of paper which is your receipt. Armed with these, you return to the first counter. There, all your bits of paper are taken from you, filed, and scribbled on. A last piece is issued. Proudly clutching this, you make all haste to the warehouseman (who is very liable to close at 4:27pm if he doesn't see anyone coming) and hand him your coupon. He disappears into the bowels of his domain and reemerges, triumphant, with your parcel.

A simple procedure indeed!

Let's just make a quick summary. Your parcel, before it is safely in your hands, has

- been entered into a computer system;
- had a form (four part) printed on its behalf;
- been scheduled onto a truck, loaded, "delivered", and returned to the warehouse twice;
- been the cause of four separate transactions, four pieces of paper, and has generated a requirement to count for 5 Belgian francs.

Can you say "make-work?" I knew you could ... And all of this assumes that there is no duty assessed on the contents. If someone deems that duty may be payable, no matter where it is addressed in Belgium, it is redirected to Brussels(!) and you must go (again within day D+7) to defend your parcel from the ravages of the exciseman. Further there is another procedure to follow if your parcel or even letter is deemed to be "non-standard" ...

Time And Pride Wait For No One

"It's the counting house or the pulpit, my dear."
From one the penny comes, and in turn becomes the pound,
Or the other, all earnest, red-faced with righteousness.
Shall the bottoms of my rolled trousers be frayed, or shall
The purse strings become a noose, and spirit ebb?
Ice and fire, that is life. One never gets the sun
Warm on one's back beside a tropic sea of delight.

Trudge and more trudge, the gilt wears off,
The plod never does make the plowed field shine
And time merely takes the fine edge from stone,
Wears it to a mere pebble, flung by a boy,
Stout-hearted, but weak-armed and ill of aim.

All this is conceit, as if I held the choice so close,
But the time comes, and one chooses, or is chosen,
And the doors open, others slam their way with a clang.
Voices whisper a welcome, or die away,
Forgetting one with time and distance.

Each instant the product of a million choices,
Choose again, and you'll never return.
Life is nought but a sum
Of "should have been" and "may one day be,"
Regret and faint hope.

-- Yasho Lahiri

All is Forgiven

A mist is in the hills, rising off the stream,
Giving way to the wind which lifts,
Strewing the dappled glory of fall
Below the soft glow of daybreak.

The road snakes its siver belly,
Past the river straining to throw it off.
Ghostly bridges, gray wood and shadows,
Pass like whispers, creep away with secrets.

I hear the murmuring of time, old farmers,
Stirring in the summer corn, dying stalks
Which carry in them next year's seeds,
In fields which heal the marks of plows.

Horses shake off plumes of water,
While pigs wallow in content.
We pass the tomato farm, and the carrots,
And the old man who turned to books.

In a way, this place is mine,
For my heart carries its peace within.
The ageless earth gives us comfort,
The cooling rain carries away our sins.

A man and woman could make a life here,
Something clean and fresh as air,
The dance of years, the waltz of centuries,
In the slow-falling leaves of autumn.

-- Yasho Lahiri

Sunday Snapshot

It's a rainy day in Belgium
The sky dark, spitting
The country music keeping rhythm
The windows smoky with rain.

Summer is over.
Chestnut leaves edged in brown
The poplar trees twisting,
Turning, bending,
The wind up whipping,
Driving in autumn once again.

-- Lali Watt
Antwerp
Belgium

"শক্তি-শরণ"

দুগ্‌গা মা'র সিংহ-বাহন
অসুরটিকে ধরলো,
অসুরটিও শক্ত পুরুষ
সিংহরে না ছাড়লো।
কামড়াকামড়ি
মারামারি
বর্শা এসে লাগলো,
অসুর তখন সিংহ ছেড়ে
মায়ের স্মরণ করলো,
মান-অভিমান
সকল ত্যেজে
মা'র শরণে আসলো॥

- রত্না দাশ

"উপলব্ধি"

বিরহ-ব্যাথার বিষাদ-সাগরে
আছে অনন্ত ব্যথা,
অ-দেখা মনের অধরা-মাধুরী
মনে আনে কতো কথা।
নীল-যমুনার অগাধ সলিল
রাধা দেখে অবাক মনে,
বৃন্দাবনের মধুর স্মৃতি
জাগে তার প্রতিক্ষণে।
মথুরা নগরে শ্যাম
গিয়েছে যে চলে,
রাধিকা কাঁদে যে বসে
বিরহ-অনলে।
মন তার চলে যায়
শ্যাম-দরশনে,
ক্ষণিক সুখের সুর
আছে পরশনে।
স্বপ্ন-ভরা সেই সুরে
আছে যে পূর্ণতা,
সকল কালিমা গেলো,
গেলো যে শূন্যতা॥

- রত্না দাশ

ফুল

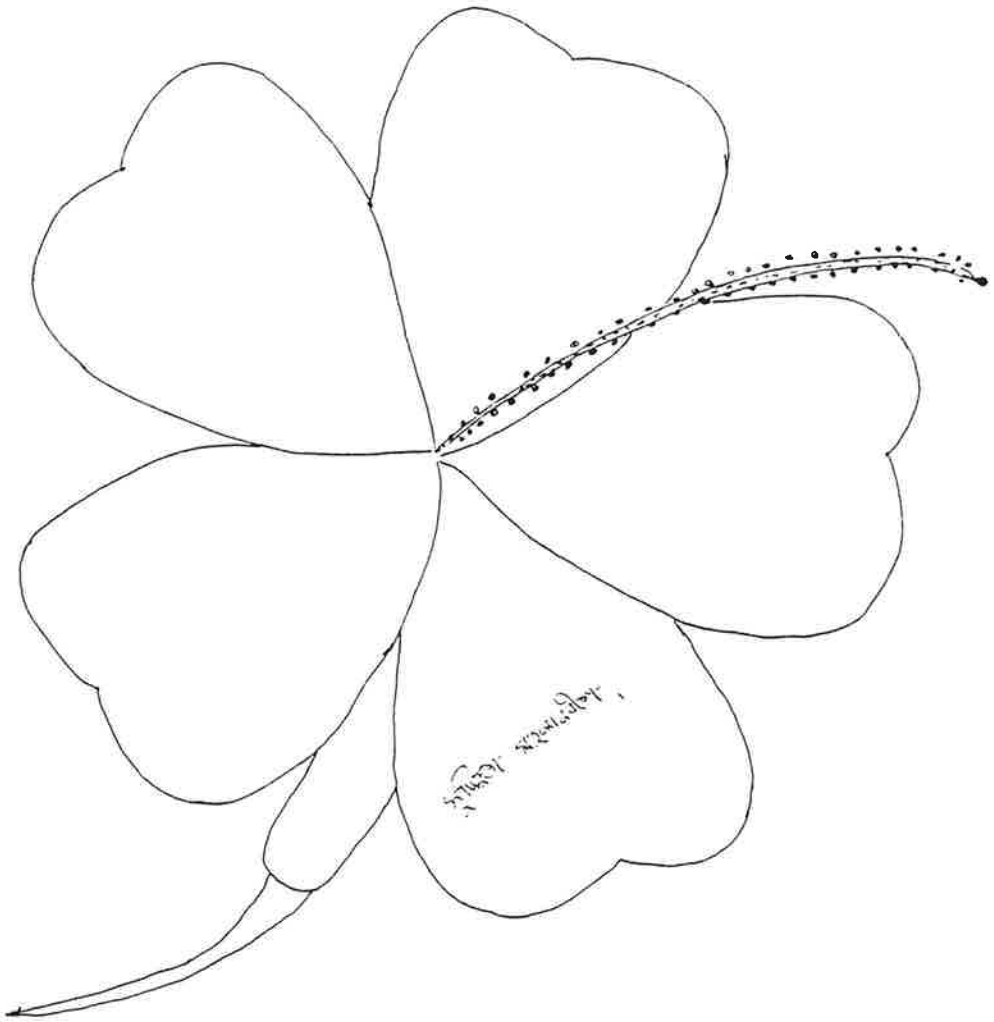

তোমার অব্যক্ত ভালবাসা, প্রাণে আনে বাঁচার লালসা,
তোমার মিষ্টি হাসি, বুকে বাজায় বসে মধুর বাঁশি।।
তোমার সজল চাহনি, বলে মোরে না জানা কত কাহিনী,
তাই তো তোমার স্থান - দেবতার থান।।

- সুস্মিতা মহলানবীশ

"বিবর্তন"

অনুযোগ করে আর কি লাভ হবে বলি
এই জীবনের যাত্রী আমি এগিয়ে পথে চলি।
ছিলেম সবুজ, মনটি অবুঝ - মনের পাখনা মেলে
উড়ে যেতাম স্বপ্নপুরে রাজকন্যের খোঁজে।
হতাম উদাস - সকাল সন্ধ্যে ভাবনা ছিলনা কিছু
হারিয়ে গেলেও ফিরে যাবার টান ছিলনা পিছু।
রাজকন্যে আমার হারিয়ে গেছে কখন অগোচরে
দৈনন্দিন এই জীবনযাত্রার সহস্র কলরবে।
সবুজ মনটি পালিয়ে গেছে দিয়ে যায়নি সাড়া
বুঝতে পারলে হয়ত আমি হতাম দিশেহারা
জীবনসূর্য্য এগিয়ে চলেছে পশ্চিম দিগন্ত ধেয়ে
অন্ধকার জানি ছড়িয়ে আছে দিক্ চক্রবাল ঘিরে,
কল্পনা আর বাস্তবেতে তফাৎ অনেক বেশি
সব জেনেই এ-মনটাকে রাখতে চাইছি খুশী।

- বিজন প্রসূন দাস

"স্বপ্নবিলাস"

ধূ ধূ মরুদ্যানে সজলতার হাতছানি
না দুর্বার মৃত্যুর আকর্ষণ,
বোঝা দায় -
পথভোলা পথিকের আশার আলো,
মৃত্যুপথযাত্রীর দুরন্ত জীবন তৃষা,
মরুতীর্থের হাতছানি,
শুধুই ভোলায়
এ নয় মরীচিকার মায়া।

স্বচ্ছ জলের সন্ধানে রত
দুর্দম নারীমূর্তির
অনন্ত সৌন্দর্য
প্রাণে আনে বসন্ত সৌকর্য,
চাঁদনী রাতে সেতারে বাজে
মিষ্টি মিলন সুর
দুরন্ত কামনায়
উদ্বেল হয় পথিকের মন
মনে ভাসে -
ঘরে প্রতীক্ষারত প্রিয়ার নিদ্রাবিহীন
ক্লান্ত আঁখি,
মৃণালভুজের ললিত বাহুপাশ।
কল্পনা বাস্তব হল বুঝি
আজি নিশিরাতে
বহু দূর দেশে
অন্যপ্রিয়ার ললিত কটাক্ষে
বিহ্বল পথিক বৃথা ছুটে মরে
প্রাণহীন তার কল্পপ্রিয়ার
মর্মর মূর্তির আলিঙ্গনে॥

- সুতপা দাস

"ভাল লাগে"

একমাত্র আমার ভাল লাগে
বিদেশে বসে দেশের কথা ভাবতে
অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ঘরে ফিরে
মা'কে দেখতে বড় ইচ্ছে করে।
কৃষ্ণচূড়া, শিমুলের ডালে কোকিল
কলাবতী ফুলে শিশির বিন্দু
শিউলী ফুলের মালা
উৎসব, কলসী কাঁধে কোন
রূপসীর মুখ।
এক মাত্র আমার ভাল লাগে
মুক্তি যুদ্ধ, মানুষ, আমার
পাড়া পড়সী, বন্ধু বান্ধব
আজও তাঁরা স্বপ্নে বিভোর।
এক মাত্র আমার ভাল লাগে
শ্রাবণের ধারা
তিতাস আমার বাড়ীর পাশেই
তার স্বাধীনতার কথা ভেবে
চৈত্রের উলঙ্গ দুপুরে উলঙ্গ
বালকের মাছ ধরা।

এক মাত্র আমার ভাল লাগে
শীতের সকালে
কুয়াশার রহস্য উন্মোচনে,
শহীদ মিনার, যুবক যুবতী
খালি পায়ে।
এক মাত্র আমার ভাল লাগে
প্রাণ জুড়ে স্নিগ্ধ হাসি
মধুচন্দ্রিমার অপেক্ষা করা কোন রমণী
গোধূলি বিকেলে রক্তিমছটা
এক মাত্র আমার ভাল লাগে
আমার দেশের অস্তিত্ব
আমার ভাষা
আমার আশা আনন্দ সুখ স্বাচ্ছন্দ
আমার মা
আমার ছোট বেলা।
আর আমার আদরের
মা'কে।

- মোঃ মোছারাতুল হক আকমল

"প্রেরণা"

গ্রীষ্মের গরম গুমট রাতে
    হঠাৎ এক দমকা ঝোড়ো হাওয়া
কোথা থেকে নিয়ে এল মনে
    সেই স্মৃতি, সেই স্বপ্ন, সেই চাওয়া?
সারাদিনের ক্লান্তি হল দূর,
বেসুরো তারে লাগল যেন সুর-
    এখন শুধু কম্পিউটারে বসে
    কবিতার ছন্দ খুঁজে পাওয়া!

- অমিতাভ সেন

"Brainwave"

In the hot summer night
 A sudden stormy breeze
Stirs up from which cell
 That dream and that longing?
My fatigue evaporates,
My strings sing in tune -
 Now to just sit at the computer
 And find the right rhythm!

- Amitava Sen

ছন্দছাড়া

কল্পনা দাস

তাগাদা আসছে বেশ কয়েকদিন থেকে, যদি কিছু দিতে হয় তো এখুনি দাও! সময় আর বেশী নেই! নিজের মন থেকেও একটা তাড়া ভাব রয়েছে, কিন্তু সময়টাকে ঠিক কব্জা করতে পারছি না! দম্কা হাওয়ার মত সময়টা কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে, বুঝে ওঠার আগেই বিকেল হয়ে যাচ্ছে, ছেলে, মেয়ে বাড়ী ফিরছে স্কুল থেকে। 'উনি' ফিরছেন অফিস থেকে। রান্না সারা, স্ন্যাকস্ দেওয়া, তখন আর মন দিয়ে কিছু কাজ করা যায়? বিশেষ করে লেখা! মনের মধ্যে একটা ছন্দ-ভাব রেখে তো ভাবতে হবে কি লিখবো?

যাই হোক আজ সব কিছু ফেলে রেখে, সকাল থেকে লেখাটা করবোই ভেবে বসেছি। বসলেই তো আর হলো না! কি লিখবো? কবিতা, গল্প না হিজিবিজি?

মনে মনে একটু হাসলাম। ভাগ্যি এদেশে এসেছিলাম! তাই তো কেমন লেখা ছাপার সুযোগ পাচ্ছি? তা না হলে শিকে ছিঁড়লেও লেখা ছাপার সুযোগ হতো না!

কবিতা ভাবার চেষ্টা করলাম। ছন্দগুলো ঠিক মেলাতে পারছি না! অক্ষর আছে, কিন্তু ওতে শব্দ হচ্ছে না বিশেষ। যাক্গে কবিতা! গল্প লিখি বরং। তাতে তো ছন্দের দরকার নেই!

কি গল্প লিখবো? প্রেমের গল্প, হাসির গল্প না বিরহের গল্প? জুতসই একটা গল্পও মনে করতে পারছি না! এত যে ছোটোবেলায় শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, আশাপূর্ণা পড়লাম, তার সে সব কোথায় গেলো?

এখন খুব দুঃখ হলো! এ কোন্ সাগর পারে এলাম? নোনা হাওয়ায় মনের ভাব ভালবাসা সবই নোনতা হয়ে গেলো? এদের মতো ইংরেজীটা শিখতে পারলাম না, মাঝখান থেকে বাংলাটাও ভুলে যাচ্ছি?

শেষ চেষ্টায় মন দিতে গিয়ে, চম্কে উঠলাম ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে। তিনটে বাজে। মেয়ে আসবে এখুনি! জলখাবার দিতে হবে, হোমওয়ার্ক শেষ করাতে হবে। তারপর ছেলে! সকার প্র্যাক্টিস আজ আবার। স্বাস্থ্যপ্রদ খাবার দেওয়া দরকার। রান্নাটাও সারা হয়নি আজ। ঝিঙেবড়াটা খুবই ভালবাসেন 'উনি'। কয়েকটা আছে। ফ্রেশ্ থাকতে থাকতে করে দিলে ভালবেসে খাবেন।

না!! আমার আর লেখার সময় হলো না আজ! বাংলাদেশের মেয়ে তুমি, এদেশে এসে ছন্দছাড়া হয়ে গেলে! ধিক্কার দিলাম নিজেকে মনে মনে।

উৎসব

কৃষ্ণা রায়

আবার বছর ঘুরে এসেছে শরৎ। সঙ্গে এনেছে নীল আকাশ, সাদা মেঘের ভেলা, কাশফুল আর শিউলি ফুল। চৌধুরীদের ঠাকুরদালানে দুর্গা প্রতিমায় শেষ রঙের প্রলেপ পড়ছে। আর কদিন পরেই শিল্পী তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে আঁকবেন মায়ের চোখদুটী। দৃষ্টির আশীষ ধারায় স্নাত হব আমরা।

কর্তাদের বড় শরিকের শেষ বংশধর সাতবছরের বিলু আর পাঁচবছরের বিমল। হাত ধরাধরি করে দেখছে মূর্ত্তিগড়া। বিস্ময়ে ওদের চোখজোড়া বড় বড় হয়ে উঠছে। শিল্পীর এক-এক তুলির টানে কেমন অসুরের ভয়ঙ্কর মুখটা ফুটে উঠছে।

এমন সময় কচি গলায় ছোট্ট একটী ডাক - 'বিলু-বিম্‌লী'। ঠাকুর দালানের আর এক কোণে দূরে জড়ো-সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আরও দুটী ছোট্ট শিশু মিলি আর রবি। ওরা ছোট তরফের, বিলু আর বিমলের সমবয়সী। এতদিন এদের হাসিকান্না, ছোটাছুটীতে মুখর থাকতো চৌধুরী বাড়ীর উঠোন। প্রতি বছর এই চারটী শিশু হাত ধরাধরি করে কত উৎসাহ উদ্দীপনায় দেখেছে মূর্ত্তিগড়া। প্রতিমা দালান থেকে মণ্ডপে উঠেছে, ঢাক বাজছে, পূজোর পাঁচটা দিন কতো মজা।

কিন্তু আজ 'সীতার গণ্ডীর' মত অদৃশ্য কোন গণ্ডী আঁকা রয়েছে দুই শরিকের মাঝে। বড়দের মন কষাকষিতে এই চারটী শিশু আজ আর হাত ধরাধরি করে দেখতে পারছেনা মায়ের চোখ আঁকা, ঝলমলে কাপড় পরানো, আরও কত রোমাঞ্চকর জিনিষ। আজ উৎসবের আঙিনায় চারটী শিশুপ্রাণে উৎসবের আলো জ্বলে উঠলোনা, উৎসবের বাজনা বাজলো না। যদিও বাইরে আছে আলোর রোশনাই আর ঢাক-ঢোলের আওয়াজ।

এই কী উৎসব? যে উৎসবের অন্তর্নিহিত অর্থ হ'ল মিলন। বন্হর মাঝে একের এবং একের মাঝে বন্হর মিলন। কোথায় সেই উৎসব যাতে বলতে পারি

'জগতে তব কী মহোৎসব বন্দন করে বিশ্ব
শ্রী সম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয় স্মরণে।'

দুর্গাপূজা কী আমাদের জাতীয় উৎসব নয়? কোথায় সেই জগৎজননী যিনি ছোট্ট শিশুদুটীকে হাত ধরে গণ্ডী পার করে নিয়ে আসবেন উৎসবের আঙিনায়। এপারের শিশু মনের আনন্দ ওপারের শিশু মনের আনন্দের সঙ্গে মিশে সার্থক হবে আজকের উৎসব। জগৎজননীতো শুধু মাটীর মূর্ত্তি নন, শুকনো মন্ত্রে তো মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। জগৎজননী তো সংসারের প্রতিটী মায়ের মধ্যে। আজও কী সেই মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়নি? কোথায় তিনি যিনি হাত ধরে সব আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে নিয়ে আসবেন উৎসবের আঙিনায় আপন প্রসাদ বিতরনের জন্য।

'বড় আশা করে এসেছি গো,
কাছে ডেকে লও,
ফিরায়ো না জননী।।'

চৈতালি

অপূর্ব রায়

"Nor law, nor duty bade me fight,
Nor public men, nor cheering crowds,
A lone impulse of delight
Drove to this tumult in the clouds;
I balanced all, brought all to mind,
The years to come seemed waste of breath,
A waste of breath the years behind
In balance with this life, this death." -- W.B.Yeats

- বলতে পার কি অপরাধ করেছিল আদম আর ঈভ? যাতে ওদের নির্বাসন করা হল কণ্ঠে ভাষা দিয়ে। নীরবতার মুখরতা হারিয়ে গেল চিরকালের মতন।

- রাতে ওই লোকগুলো ঘুমায় কি ভাবে - যারা বিমান দুর্ঘটনায় আণ্ডিজ পর্বতমালার গায়ে পড়ে ছিল আর সহযাত্রীর দেহ খেয়ে বেঁচে ছিল?

- Sub-Sahara ধরে লোকগুলো পড়ে আছে। সাথে ওদের স্বপ্ন আর গবাদি পশু।

- Tower of silence এর উপরে ঘুর ঘুর করছে কয়েকটা শকুনি। এই এল-এলরে -- একটা ভোজ। হিপ হিপ হুরে!

- সাল ১৯৭২।
বাঙ্গলাদেশের এক নিষিদ্ধপল্লী। ল্যাম্পপোষ্টের গায়ে দাড়িয়ে আছে - পাশে একটি খেঁকি কুকুর। মনের সুখে ধান ভান্‌তো এইতো কদিন আগে।

  লায়লা: ওসমান, বল আমায় ছুয়ে তুমি ওসবের মধ্যে ছিলে না।
  ওসমান: (চকিতে একটা ভীতা মুখ মনে পড়ে যায়) লায়লা! আমার লায়লী!

- আচ্ছা! oscillation theoryটা যদি ঠিক হয় তবে আমরা আবার কাছে আসবো - কিছুক্ষণের জন্য হয়ে যাবো point singularity। তবে মহাকাশের মানে হয়তো বড়ই হবে - তাহলে? আমরা আবার পাশাপাশি বসে কথা বলতে পারবো? চোখের ক্ষমতা কমে আসছে দ্রুত। তুমি আমার দেওয়া আংটি আর ঘন সবুজ শাড়ীটা পরে এসো - আমি ঠিক চিনে নেব।

আমার কেন জানি আশংকা হচ্ছে - বোধহয় steady state theoryটাই ঠিক - তবে? ক্রমশঃ আরো, আরো দূরে চলে যাবো পরস্পর থেকে? তখন না পৌছবে ডাক, না মোর ভাবনা।
বুদ্ধিমান লোকেরা অযথা ঝুঁকি নেয় না। এসো, বরং বেলায় বেলায় এক পাত্র থেকে একটু শ্যাম্পেইন পান করা যাক। দেখো! দেখো! কি সুন্দর ঝিলিক দিয়ে উঠলো বুদবুদটা। এ ব্যাটা আমাদের ঠোঁটের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করছে। ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দাও। প্রজাপতিটা হেসে উড়ে গেল। Resurrection!

- I'm waiting.
  Was I here yesterday? No!
  Will I be here tomorrow? No!
  Does yesterday or tomorrow exist? No!
  Only today, never ending today.
  Do you listen?
  I'm waiting. But, but what I'm
  going to ask when I see Him? What?

- আমাকে চিনতে পারছ না?
  না!
  একেবারেই চিনতে পারছ না?
  না!
  আমায় মনে পড়ে না তোমার?
  না!
  একটুও না?
  না!

সৃষ্টিকর্তা মৃদু মৃদু হাসছেন - আর গোঁপে তা দিচ্ছেন। মহাকালের বাজনা বেজে চলেছে পেছনে: তা-ধিন্! ধিন্-তা!

চার আনা

সোমনাথ মিশ্র

বছর চারেক আগেকার কথা। কলকাতা গিয়েছিলাম বিশেষ কাজে। দুর্গাপুজোর ঠিক পরে পরেই। নভেম্বর মাসের তখন সবে শুরু। আকাশে বাতাসে বিদায়ী শরতের স্পর্শ তখনো মিলিয়ে যায়নি। কলকাতায় ঠাণ্ডা যদিও খুব একটা পড়েনা তবু কিছু কিছু অঞ্চলে বোধকরি শীতটা একটু বেশীই লাগে। সল্টলেকের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আমার বন্ধু জয়ন্তর বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলাম। চাকরির সূত্রেই জয়ন্তর সঙ্গে আলাপ, আগে যাদবপুরে থাকতো। ইদানীং জয়ন্তর বাবা সল্টলেকে স্টেডিয়ামের কাছে ছোট্ট, সুন্দর দোতলা বাড়ীতে উঠে এসেছেন।

সল্টলেক জায়গাটা বেশ সাজানো গোছানো। বিধান রায়ের উদ্যোগেই এই অঞ্চলে লোক বসবাসের ব্যবস্থাপনা শুরু হয়। তাই এই উপনগরীর আরেক নাম বিধাননগর। দুই দশক আগেও খাল বিল ও নালা ছাড়া আর কিছু ছিলনা। আজকের সল্টলেকের সঙ্গে অবশ্য তার কোন মিল নেই। বড়ো বড়ো বাড়ী ও অফিস এবং হাউসিং কম্প্লেক্সে ছেয়ে গিয়েছে চতুর্দিক। চওড়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট। সুন্দর সুন্দর মার্কেট কম্প্লেক্স। কলকাতার অংশ বলে মনেই হয়না। পুরো অঞ্চলটা বিভিন্ন ব্লকে ভাগ করা - এ.বি., এ.সি., এ.ডি., বি.সি., বি.ডি. ইত্যাদি। হাউসিং সোসাইটির নামগুলোও ভারী মিষ্টি - শ্যামলী, লাবণী, বিদ্যাসাগর, পূর্বাশা, করুণাময়ী, - আরো কত কি।

আমি যাচ্ছিলাম বিদ্যাসাগর হাউসিং সোসাইটির পাশ দিয়ে। কাছেই লাবণীর বাস স্টপ। হাওড়া, যাদবপুর, ইত্যাদির বাসগুলো ওখান থেকেই ছাড়ে। আগে ওইটাই সল্টলেকের প্রধান বাসস্টেশন ছিল। এখন অবশ্য করুণাময়ী ও স্টেডিয়ামের কাছেও নতুন নতুন বাসস্টেশন হয়েছে।

লাবণীর বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে যথারীতি ফুচকাওয়ালা ও চায়ের দোকানীর ভীড়। সন্ধ্যে বেলায় সেখানে নানা লোকের ভীড়। কেউ অফিস থেকে বাড়ী ফিরে যাবার পথে চা খেতে খেতে বাস ছাড়ার অপেক্ষা করছে। এক কোণে পাড়ার ছেলেদের আড্ডা। আরেক কোণে পাড়ার বৃদ্ধদের আড্ডা। দেশের ও সংসারের হাজারো সমস্যার লক্ষ লক্ষ সমাধান চায়ের কাপে ও সিগারেটের ধোঁয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। আরেক জায়গায় আবার পসারীদের ভীড় - আলু, বেগুণ, পালংশাক, ধনেপাতা থরে থরে সাজানো। ফুচকাওয়ালাদের কাছে বাচ্চারা ভীড় করে দাঁড়িয়ে - মায়েরাও বাদ যায়নি। থেকে থেকে তাদের হাঁক শোনা যাচ্ছে - "টাকায় দশটা, টাকায় দশটা।" পুজো শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ছুটির আমেজ তখনো যায়নি।

দেখতে দেখতে কখন আমি লাবণীর বাসস্টপ ছাড়িয়ে পূর্বাচলের দিকে এগিয়ে পড়েছি। এদিকটায় আলো কম বলে রাস্তাটা একটু অন্ধকার। শালটা ভালো করে জড়িয়ে নিলাম ঠাণ্ডা লাগছিল বেশ।

এক হাতে একটা মিষ্টির প্যাকেট ছিল। অন্নপূর্ণা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে কেনা। এদের আবার মিষ্টি দই খুব নাম করা। দেখে নিলাম প্যাকেটটা ঠিক আছে কিনা।

এমন সময় পেছন থেকে কে যেন কচি গলায় ডাকলো "বাবু একটু শুনবেন!" ঘুরে তাকিয়ে দেখি একটা বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। কতই বা বয়স হবে তার - বড়ো জোর বছর দশেক। রোগাটে চেহারা। মাথার চুলগুলো উসকো খুসকো। গায়ে হাফ-হাতা জামা, পরণে হাফ-প্যাণ্ট। ঠাণ্ডায় যে বেশ অসুবিধে হচ্ছে তা বুঝতে পারলাম। মুখটা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিলনা।

আমি বললাম "কিরে, কিছু বলবি?" ছেলেটি চুপ করে রইল - কোন জবাব দিলনা। বুঝলাম বলতে ইতস্ততঃ করছে। আমার যাবার তাড়া ছিল। তাই একটু বিরক্তও হচ্ছিলাম। কিন্তু কেন জানিনা মন চাইলনা ওর কথা না শুনে চলে যেতে।

ওকে আশ্বস্ত করার জন্য কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "কি নাম তোর?" ছেলেটা মুখ না তুলেই উত্তর দিল "বাবলু।" "বাঃ খুব সুন্দর নাম তো" আমি বললাম।

ছেলেটি এবারে আমার মুখের দিকে তাকালো। এক আগন্তুকের এই কৌতূহল দেখে কি ভাবলো কে জানে। হাত দিয়ে মুখটা মুছে বললো "মা দিয়েছে। আমার বোনের নাম বাবলি।" ভাই-বোনের নামে বেশ সুন্দর ছন্দ রয়েছে এবং সেটা যে তার খুব ভাল লাগে এটুকু জানলাম।

"তা বাবলু, কোথায় থাকিস এখানে?"

"ওই যে ওই-ইখানে" বলে ডান হাত দিয়ে দূরে অন্ধকারের দিকে ইঙ্গিত করলো। আমি অবশ্য পরিষ্কার করে ঠিক কোথায় বুঝতে পারলাম না। তবে আন্দাজ করলাম যে লাবণীর কাছে কিছু ঝুপড়ি বস্তি আছে - হয়তো সেখানেই কোথাও থাকে।

এবারে আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম "আচ্ছা বাবলু, তুই তো আমায় বললি না যে কি জন্য আমায় ডেকেছিলি?"

বাবলু আবার মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

"দ্যাখ্ বাবলু, আমার তাড়া আছে।" আমি একটু অধৈর্য হয়ে পড়ছিলাম বইকি।

হয়তো সেটা বুঝতে পেরে, বাবলু এবারে মুখ তুলে তাকালো। "বাবু আমি সকাল থেকে কিছু খাইনি। তাই মা বললো যে দুটো রুটি কিনে আনতে।" এই বলে সে থামলো। গলাটা কেমন ম্লান শোনাচ্ছিল। "মায়ের জ্বর থাকায় সারাদিন বেরোতে পারেনি। তাই আমাকে পাঠালো। আপনি আমায় চার আনা পয়সা দিতে পারবেন? আমি দাদুর দোকান থেকে রুটি কিনে ফিরে যাবো।"

শুনে বেশ খারাপ লাগলো। "আচ্ছা দাঁড়া, দেখি আছে কিনা।" পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখি টাকা-পয়সা বলতে শুধু আট-আনা পড়ে আছে। সন্ধ্যে বেলায় বেশী টাকাপয়সা নিয়ে কলকাতায় হাঁটা চলা করার সাহস হয়না। শুধু বাস ভাড়াটা থাকে। আর সঙ্গে দু-একটাকা খুচরো। সেদিন ওই আট-আনা ছাড়া আর কিছুই ছিলনা।

মনে মনে ঠিক করলাম যে ফেরার কথা পরে ভাবা যাবে। তাই ওই আট-আনাটাই তার হাতে তুলে দিয়ে বললাম "এইনে, এইটা রাখ্।"

বাবলু আট-আনাটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো "বাবু, আমি তো চার-আনা চেয়েছিলাম। আপনি আমায় আট-আনা দিলেন যে?"

আমি আশ্চর্য হয়েই বললাম "কেন তোর লাগবেনা বুঝি?"

সে জবাব দিল "মা বলেছিল যে চার আনায় দুটো রুটি হয়ে যাবে। আমি আর বোন ভাগ করে নেবো - আমাদের ওতে হয়ে যাবে। মা আজ খাবেনা বলেছে। তাই আমি আট-আনা নিয়ে কি করবো?"

আমি অবাক হয়ে গেলাম তার সরলতা দেখে। হয়তো এক শিশুর দ্বারাই এইরকম চিন্তা সম্ভবপর। তার প্রয়োজনবোধ সম্পর্কে সে নিঃসন্দিহান, দরকারের বিন্দুমাত্র বেশী তার চাহিদা নেই - চরম অভাব-দুর্দশাতেও নয়। বিভিন্ন প্রয়োজনের চাহিদা মেটাতেই আমাদের সবার এই নিত্য জীবন যাপন, পথ চলার পালা। কিন্তু ক'জন পারবে এমন স্বল্প পরিসরে নিজের প্রয়োজনবোধকে প্রকাশ রতে? কজনই বা জানে তার প্রয়োজনের শুরু কোথায়, শেষই বা কোথায়? যদি এই সীমাজ্ঞান সম্পর্কে সম্যকজ্ঞান আমাদের সবার থাকতো, জীবনের অনেক সমস্যাই হাল্কা হয়ে যেতো, অশান্তির বোঝায় মন ভার হোত না, অপ্রাপ্তির ব্যথায় হয়তো এতটা ভুগতে হতো না।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম বেশ কিছুক্ষণ। হঠাৎ মনে পড়লো, বাবলু তখনো জবাবের জন্য অপেক্ষা করছে। তার পিঠে হাত রেখে বললাম "তুই রেখে নে ওটা। পরে লাগতে পারে।" ও কি ভাবলো কে জানে।

কিছুক্ষণ হাতে ধরা আট-আনাটাকে নাড়তে নাড়তে সে বললো - "আচ্ছা বাবু, আমি তাহলে চলি। দাদুর দোকানটা বন্ধ হয়ে যাবে একটু পরে।" আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। ঠায় কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে যতক্ষণ না ও লাবণীর ট্রাফিক আইল্যাণ্ডটার পিছনে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

হয়তো আর কোনদিনই দেখা হবেনা তার সঙ্গে। ফুটপাথের ছেলে, হয়ত রাস্তার ধারেই বড়ো হবে। তারপর হয়তো আবার এই শহরতলীর রাস্তাতেই একদিন চুপিচুপি হারিয়ে যাবে - কে বলতে পারে? কেউ মনেও রাখবেনা, চোখের জলও ফেলবেনা। তবু জগতের এদের আসার প্রয়োজন রয়েছে। অভাবের মধ্যেও যে শান্তি আছে, দুঃখ ঘেরা জীবনেও যে আনন্দস্রোত একেবারে স্তব্ধ হয়ে থাকেনা, সারারণ থেকেও যে মনকে উদার ও অসংকীর্ণ করে রাখা যায় - এ শিক্ষা জগতে কে দেবে?

তাই বুঝি এই শিশুরাই বলতে পারে "আমি নইলে মিথ্যা হতো সন্ধ্যেতারা ওঠা।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় সাড়ে আটটা বেজে গিয়েছে। যাদবপুরের লাস্ট বাস পেরিয়ে যেতে খেয়াল পড়লো। আমি আবার হাঁটা দিলাম। থেমে থাকার যে উপায় নেই।

ভূত

হর্ষ মুখার্জ্জী

সে অনেকদিন আগের কথা। তখনও ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়নি। তখন ক'লকাতা শহর আজকের মত ছিলো না। ছিলো না লোকের এত ভীড় আর যানবাহনের সমস্যা, বা এমন চোর-ছ্যাঁচোড়ের উৎপাত। ক'লকাতা তখন খুবই শান্ত ও পরিস্কার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন দারুণ ভাবে লেগেছে। তাই রাতে সমস্ত ক'লকাতা শহর অন্ধকার। রাস্তায় আলো নেই বল্‌লেই চলে। যা-ও কিছু আলো আছে তা-ও আবার ঢাকা। তখন সন্ধ্যের পর রাস্তায় লোক খুঁজে বের করা খুবই শক্ত ছিলো। শুধু মাঝে মাঝে মিলিটারী ট্রাক চলার আওয়াজ হত। এই অন্ধকার পথে তখন ঘুরে বেড়াত যত গুণ্ডা, পুলিশ আর "এ-আর-পি"-র দল। ("এয়ার-রেড-প্রিকশান" অফিসে যারা কাজ করত তাদের "এ-আর-পি" বল্‌তাম।) সন্ধ্যের পর সমস্ত ক'লকাতা যেন ঘুমিয়ে পড়তো। এরই মাঝে প্রায়ই বেজে উঠ্‌তো "সাইরেন"। আর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় বেজে উঠ্‌তো "এ-আর-পি"-দের বাঁশীর আওয়াজ। শহরে লোকজন ত' মোটেই ছিলো না। দু এক বাড়ীতে যে দু'একজন ছিলো তারা তখন ইষ্টনাম জপ করতে থাক্‌তো। এমনই ছিলো তখনকার ক'লকাতার রাত।

আর সূর্য্যের আলো ফুট্‌তে না ফুট্‌তেই এ-বাড়ী ও-বাড়ীর যে দু-'একজন ছিলো তারা জড়ো হতো পাড়ার একটা কোনও রকে। আর একটা খবরের কাগজকে কাড়াকাড়ি করে সবাই পড়্‌তো। তারপর, আরম্ভ হ'তো যুদ্ধের পরিস্থিতি কিংবা ক'লকাতার অবস্থা নিয়ে তুমুল আলোচনা। সে আলোচনা শুন্‌লে মনে হ'তো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যেন ঐ রকেই বেধে গিয়েছে।

এ-ত' গেল বুড়োদের কাজ। মধ্যবয়সী যে কয়েকজন ছিলো তাদের কাজ ছিলো - আরও ভোরে উঠে কোথাও কোন দোকানে মারপিট্ করা - ধাক্কাধাক্কি ক'রে এক সের কি দু'সের চাল পাওয়া যায় কি না তার চেষ্টা করা। অফিসে যাবার তেমন তাড়া ছিলো না। কারণ, তাড়া দেবার লোকেদেরও ত' দেরী হ'তো অফিস যেতে। তাছাড়া, যাকে বকাবকি করবে দেরী হবার জন্য সে হয়তো বা চাক্‌রী ছেড়ে দিয়েই চলে যাবে। বোমার ভয়ে বেশীর ভাগ বাড়ীর কর্ত্তারা গিন্নী আর ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিয়েছিলো গ্রামে। কেউ কেউ আবার চাক্‌রী ছেড়েই চলে গেলো গ্রামে প্রাণ বাঁচাতে। তখন ঝামেলা ছিলো অফিসের বড় বাবুদের। অফিস কাজ করার লোক পাওয়া খুবই কঠিন ছিলো। "চাকুরী খালি আছে" বলে বিজ্ঞাপন দিয়ে - এমন কি "যুদ্ধের ভাতা" হিসেবে বেশী টাকা দিয়েও অফিসে কাজের লোক পাওয়া যেত না। বাড়ীওয়ালাদের অবস্থাও ছিলো তাই। তারা তখন ভাড়াটেদের একরকম পায়ে ধরে - অনুরোধ করে - ভাড়া কমিয়ে বাড়ীতে রাখতো। তা না হ'লে যে আবার তাদের অন্ন মারা যায়। অনেকে আবার খালি বাড়ীগুলো অন্যের জিম্মায় দিয়ে যে যার গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে উঠে বসেছে।

এ হেন অবস্থায় আমাদের পাড়ার দুঃখীরামবাবু আর ভরসা না পেয়ে চল্‌লেন তাঁর গ্রামের বাড়ীতে। এতদিন তাঁর গিন্নি আর ছেলেমেয়েদের গ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে আঁকড়ে বসেছিলেন তাঁর এই বাড়ীটাকে। কিন্তু ইদানীং প্রায়ই কাগজে নানা জায়গাতে বৃটেনের পরাজয়ের খবর পড়ে ক'লকাতাতে থাকার ভরসা হারিয়ে ফেলেছেন। তাই তিনি এ বাড়ীর মায়া একেবারে কাটাতে না পেরে, এ-পাড়ারই সব্যসাচীর হেপাজতে বাড়ীখানা রেখে চল্‌লেন গ্রামের বাড়ীতে।

সব্যসাচী একা মানুষ। এ পৃথিবীতে বন্ধু-বান্ধব ছাড়া আপন বল্‌তে তার আর কেউ নেই। "ডালহাউসী স্কোয়ারে" (বর্ত্তমানের বি.বি.ডি. বাগ) কোন এক অফিসের কেরাণী ছিলো এই সব্যসাচী। মাসের শেষে যে কটা টাকা মাইনে পেতো, তাতে তার খুব ভালোভাবেই কেটে যেতো - উপরন্তু আমাদের জন্যও বেশ কিছু খরচ করতো নিয়মমত। সব্যসাচীর বয়স তখন পঁচিশ-কি-ত্রিশ। খুব গল্পপ্রিয় লোক। নিজে যেমন গল্প শুনতে পছন্দ করতো, তেমনি সুন্দর বল্‌তেও পারতো।

দুঃখীরামবাবু চলে যাবার পর আমাদের পাড়ার লোকসংখ্যা দাঁড়ালো দশ। আমাদের এই দশজনের ওপর ভার ছিলো পনেরোখানা বাড়ী দেখার। বাড়ীগুলো সবই ছেলো প্রায় তালাবন্ধ। আমরা সবাই মিলে থাক্‌তুম একটা বাড়ীতে। সকালে আর সন্ধ্যের দিকে সবাইমিলে একবার করে বাড়ীগুলো ঘুরে দেখে আস্‌তুম। আর ঐ সঙ্গে বাজারটাও সেরে ফেল্‌তুম। আমাদের মধ্যে অনিল ভাল রাঁধতে পারতো। তাই, রান্নার ভার ছিল তারই ওপর। অফিস যাবার আগে - অফিস থেকে এসে - প্রায় সব সময়ই চলতো প্রচুর আড্ডা আর বাজি রেখে তাস খেলা। ঐ সঙ্গে প্রায়ই চল্‌তো ঘটাকরে খাওয়ার ব্যাবস্থা। অফিস যাওয়া যে একটা কাজ - তা মনেই হ'তো না। এগারোটার সময় হেলে দুলে কোনও মতে অফিস পৌঁছুতুম আর পাঁচটা বাজতে না বাজ্‌তেই বেরিয়ে পড়তুম বাড়ীর পথে। অফিস থেকে ফিরে চায়ের সঙ্গে জমতো আমাদের দশজনের আড্ডা। কোন কোনও দিন সে আড্ডা চল্‌তো রাত ১২টা-১টা পর্য্যন্ত। আবার কোনও দিন সে আড্ডা আরও গভীর রাত পর্য্যন্ত চল্‌তো। এই আড্ডার মাঝেই রান্না খাওয়া সেরে নিতুম।

সেদিন শনিবার - "হাফ্‌ডে অফিস"। দুপুর দেড়টার মধ্যেই সবাই এসে বাড়ী পৌঁছেছি। সব্যসাচী তখনও এসে পৌঁছয়নি। আমরা কিছুক্ষণ সব্যসাচীর জন্য অপেক্ষা করে বসে গেলুম তাস নিয়ে। সন্ধ্যে ৬-টার সময় সব্যসাচী বাড়ী ফির্‌লো। ওকে দেখেই সবাই মিলে একসঙ্গে জিজ্ঞেস ক'রলুম - "কি রে? আজ এত দেরী হ'লো যে?"

সব্যসাচী বল্‌লে, "শরীরটা খুব খারাপ লাগ্‌ছিলো - তাই লেকের পাড়ে কিছুক্ষণ বসেছিলুম।"

আমি বল্‌লুম, "শরীর খারাপ বল্‌ছিস - এখন কেমন আছিস?"

ও বল্‌লে, "নাঃ। মাথাটা এখনও বেশ ঝিম্ ঝিম্ করছে।"

"আবার জ্বর হয়নি ত? দেখি।" - বলেই

সব্যসাচীর কপালে হাত ঠেকাতেই বুঝলুম - ওর বেশ জ্বর হয়েছে। "সে কিরে! জ্বরে ত' শরীর পুড়ে যাচ্ছে।" তাড়াতাড়ি করে বিছানা পেতে সব্যসাচীকে বিছানায় শুয়ে দিলুম। সব্যসাচীর এমন অবস্থাতে স্বভাবতঃই আমরা সবাই খুব মুষড়ে পড়লুম। আমাদের জমাট আড্ডা ভেঙ্গে গেলো। দেখতে দেখতে রাত বেড়ে গেলো। একটা ডাক্তার ডাকারও উপায় নেই এত রাতে। কোন পাড়ায় যে ডাক্তার আছে - খুঁজে বের করাও দুঃসাধ্য। বিশেষ করে এই অন্ধকার রাতে। সকলেই তাই ভোরের অপেক্ষায় রইলুম। রাতে সব্যসাচীর জ্বর আরো বাড়লো। আমাদের কারও ঘুম হ'লো না - প্রায় সবাই একপ্রকার বসেই রাত কাটালুম। ভোর হতেই আমি আর সুনীল বেড়িয়ে পড়লুম ডাক্তার খুঁজতে। অনেক খোঁজার পর ভবানীপুর অঞ্চল থেকে এক ডাক্তারকে এনে দেখালুম। পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, "অসুখটা কঠিন বলেই মনে হচ্ছে। চার-পাঁচ দিন না গেলে সঠিক কিছুই বলা যাচ্ছে না। আমার সঙ্গে চলুন - একটা ওষুধ দিচ্ছি। এতেই আশাকরি ভালো হ'য়ে যাবে।"

ওষুধ খাওয়ানো চলতে লাগলো। একদিন একদিন করে পাঁচদিন কেটে গেলো। সব্যসাচীর জ্বরের কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেলো না। আজকাল আবার রাতের দিকে জ্বরের মাত্রা বেড়ে যায়। আর জ্বরের ঘোরে সব্যসাচী কত কি আজে বাজে বকতে থাকে।

আমাদের এই তল্লাটে আর একটা ডাক্তারও নেই যে তাকে দেখাবো। সবাই যেন যুদ্ধের ভয়ে পালিয়েছে। তাই বাধ্য হয়েই এঁকে দিয়েই সব্যসাচীর চিকিৎসা চললো। অনেকবারই ওষুধ বদলে দিলেন, কিন্তু কিছুতেই কোন উপকার দেখছি না। আমরা দু-দুজন ক'রে অফিস কামাই করে সব্যসাচীর দেখাশোনার ব্যবস্থা ক'রে চলেছি। দশ দিনের মাথায় সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফেরার পথে বিনয় "লিণ্ডসে ষ্ট্রীট্" থেকে একজন নামকরা ডাক্তার নিয়ে এলো। সব্যসাচীকে অনেক পরীক্ষা ক'রে, একটা বিরাট "সিরিঞ্জ" দিয়ে ইন্‌জেক্‌শান দিয়ে বললেন - "আপনারা বড় দেরী ক'রে ফেলেছেন। রোগীর অবস্থা বিশেষ ভালো না। এখানে কিছু করাও সম্ভব না। একে এখন হাঁসপাতালে নেওয়াও যাবে না। আমি একটা ওষুধ দিচ্ছি - এতে কিছু উপকার হ'লেই আমাকে খবর দেবেন। দেখা যাক্, কি করা যায়।

বিনয় ডাক্তারের সঙ্গে গিয়ে, ওঁর চেম্বার থেকে ওষুধ নিয়ে এলো। ওষুধ খেয়ে সব্যসাচী দু'একবার চোখ মেলে তাকিয়ে কয়েকবার কিছু বলার চেষ্টা ক'রেছিলো। আমরাও ওকে দেখে কিছু ভরসাও পেয়েছিলুম। কিন্তু, সেদিন রাত প্রায় ১২টার সময় সব্যসাচী আমাদের ছেড়ে চলে গেলো।

অনেক কষ্টে সেই রাতে শবযাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে রাত প্রায় দুটোর সময় আমরা ন'জন চললুম সব্যসাচীর শেষকৃত্য সমাপনে। শ্মশানের কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি তখন "সাইরেন" বেজে উঠলো। তাড়াতাড়ি পা-চালিয়ে শ্মশানে পৌঁছে সব্যসাচীর মৃতদেহটাকে খাটের ওপরে একটা কাপড়দিয়ে পুরো ঢেকে আমরা সবাই গিয়ে "শেলটার" নিলুম একটা "ট্রেঞ্চে"। কিছুক্ষণ বাদে, কয়েকটা

প্লেনের শব্দ শুনলাম, আর ঐ সঙ্গে কয়েকটা গোলার মৃদু আওয়াজ। তারপর সব নিস্তব্ধ। এমনই নিস্তব্ধ যে সময় আর কাটে না - এক এক মিনিট মনে হচ্ছে এক এক ঘণ্টা। তারও অনেকক্ষণ বাদে "অল ক্লিয়ার সাইরেন" বেজে উঠ্লো। আমরা আবার ফিরে এলুম শ্মশান ঘাটে। আমাদের সঙ্গের তিন-চারজন গেল সৎকারের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের জন্য শ্মশান অফিসে, আর আমরা বাকী সবাই চলেছি ফেলে আসা সব্যসাচীর মৃতদেহের দিকে। চারদিক ঘন অন্ধকারে ঢাকা। মনে হচ্ছে এ-অন্ধকার অমাবস্যার রাতকেও হার মানিয়েছে। দূরে শ্মশানের এক পাশে এক সাধুবাবার আখড়ায় একটু একটু আগুন জ্বলছে। মনে হচ্ছে সাধুবাবা তারই পাশে শুয়ে আছে। শ্মশানঘাটের দেওয়ালের গায়ে যে ঢাকা বিজলীবাতি জ্বল্ছে, তাতে অতি কাছের বস্তুটিও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না - ওটা থাকা আর না থাকা সমান। দূরে অন্ধকারের মধ্যে সাদা কাপড়ে ঢাকা সব্যসাচীর মৃতদেহটা বেশ ভালই দেখা যাচ্ছে। আমরা যখন মৃতদেহের বেশ কাছে এসে পৌঁছেছি - মনে হলো মৃতদেহটা যেন হঠাৎ নড়ে উঠ্লো। ভয়ে সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠ্লো। আমরা সবাই থম্কে দাঁড়ালুম। দেখি কি হয়। সাদা কাপড় সরিয়ে মৃতদেহটা খাটের ওপর উঠে বস্লো। আমরা সবাই হতবাকের মত দাঁড়িয়ে সেই নির্জন পুরিতে দেখ্ছি সেই মৃতদেহের খেলা। একটু পরেই চারদিক দেখে আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে মৃতদেহ চল্লো সাধুবাবার আখড়ার দিকে। অমিয় তখন চিৎকার করে বলে উঠ্লো - "আরে, সব্যসাচীর মড়াদেহ যে পালিয়ে যাচ্ছে। ধর - শিগগির ধর।" সবাই ছুটলুম সব্যসাচীর চলন্ত মৃতদেহের পেছনে। আমাদের দৌড়তে দেখে সেও জোরে ছুট্তে লাগ্লো, এবং বেগতিক দেখে সে ছুট্লো রাস্তার দিকে। তার পেছনে ছুট্তে ছুট্তে রাস্তার একটা ল্যাম্পপোষ্টের নিচে তাকে ধরে ফেল্লুম। তাকে ধরতেই সে কেঁদে ফেল্লে। রাস্তার ল্যাম্পপোষ্টের আলোতে দেখতে পেলুম এ আমাদের সব্যসাচীর মৃতদেহ নয় - শ্মশানের একটা পাগলের জীবন্ত দেহ।

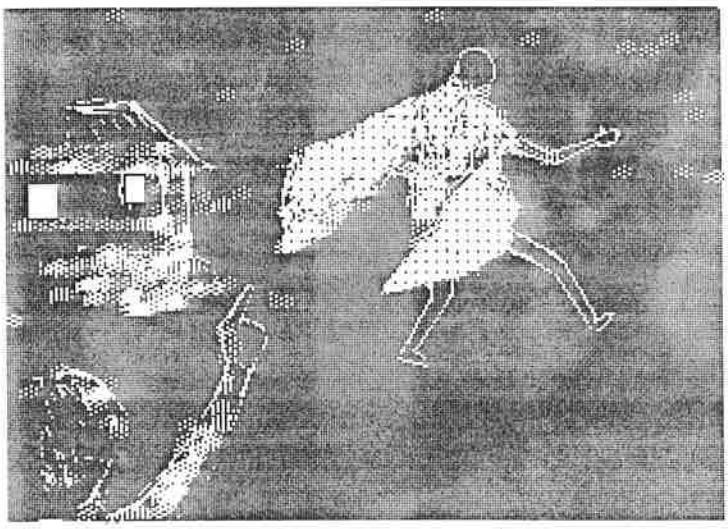

Art: Amitava Sen

হঠাৎ দেখা

রেখা মিত্র

আমি কাজ করি কানাডার একটা নামকরা শহরের কেন্দ্রস্থলে। আমার অফিসঘর তিনতলায় রাস্তার ধারে। আমাদের অফিসের উল্টোদিকে একটি ন'তলা হোটেল বাড়ী। আমাদের অফিসের কাজে কয়েকদিনের জন্য যাঁরা আসেন তাঁদের ওখানেই রাখা হয়। ঐ হোটেলের তিনতলার আর সাততলার ঘরগুলোর সংগে রান্নাঘরের ব্যবস্থা আছে। কেউ কেউ বেশীদিনের জন্য এলে ওখানে থাকাই পছন্দ করেন, নিজের মত করে খাওয়াদাওয়া করতে পারেন, পরিবারবর্গ সংগে থাকলে তো কথাই নেই। বিশেষ করে সকালের চা খাওয়ার জন্য বাইরে যেতে হয় না। মাঝে মাঝে আমার অফিস ঘরের জানালা দিয়ে ঐ হোটেলের বাসিন্দাদের দেখতে পাই, সামনের বারান্দায় তাঁরা কখনও কখনও এসে দাঁড়ান, বাচ্চারা সংগে থাকলে তো তাদের ঐখানেই বেশী সময় কাটে। নীচের রাস্তায় গাড়ী, বাস ও লোক চলার বিরাম নেই, সেই দেখে তাদের দিন কাটে।

সেদিন সোমবার বিকেল - অফিস ছুটি হবার সময় প্রায় - এক শাড়ীপরা মেয়ে ও তার স্বামীকে দেখলাম। শাড়ীপরা দেখে ভারতীয় ধরে নিলাম। দুজনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে, হাতে চায়ের পেয়ালা। কবে এসেছেন - কদিন থাকবেন কে জানে!

মঙ্গলবার খুব সকালেই কাজে এসেছি, খানিকটা কাজের পর কফির কাপ হাতে নিয়ে জানলা দিয়ে দেখি সেই মহিলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্বামীকে হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছেন। ভাবলাম - ওঁরা তাহলে কোন কাজেই এসেছেন, শুধু বেড়াতে নয়। তারপর মহিলা রেলিংএ হাত রেখে তার ওপর চিবুকে ভর দিয়ে রাস্তা দেখতে লাগলেন। হঠাৎই বড় চেনা লাগলো ভঙ্গীটা প্রায় ২৭ বছর আগে আমার বোন বেলার বন্ধু ঠিক ঐভাবে দাঁড়াতো ওদের দোতলার বারান্দায়, আমাদের বাড়ীর ঠিক উল্টোদিকে। কতদিন আগে চোখভরা জল আর হাসিমাখা মুখে যে আমায় বিদায় জানিয়েছিলো, এই কি সেই অনীতা? কতদিনের কত কথা সিনেমার পর্দ্দার মত মনের পর্দ্দায় এসে যাচ্ছে। একবার মাবাবা বাড়ী নেই, ছুটির দিন ওরা দুজনে পড়াশুনো করছে হঠাৎ আমার ঘর থেকে গোঙ্গানীর আওয়াজ পেয়ে বেলা এসে দেখে আমার খুব জ্বর বেহুঁস হয়ে আছি। ওরা দুজনে মাথাধোয়ার ব্যবস্থা করে, অনীতা জলপটি দিয়ে মাথায় হাওয়া করতে থাকে। ঐ ঘোরেই ওর হাতটা চেপে ধরে আমি ঘুমিয়েছি। কতক্ষণ জানিনা, জ্বর কম্‌লে 'বেলা জল খাব' বলে চেয়ে দেখি অনীতার হাত আমার হাতে ধরা। ও যত্ন করে তুলে জল খাওয়ালো, বললো বেলা চান করতে গেছে। সেদিন ও কাছে না থাকলে বেলার খুবই অসুবিধা হত। তারপর আমরা দুজনে আস্তে আস্তে দুজনের মনের কাছে এসেছিলাম।

আমার ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করার পর, জার্ম্মাণীতে যাবার কথা জানালাম মাকে। মা জানালেন বিয়ে করে যেতে হবে।

আমি অনীতাকে বিয়ে করতে চাইলে মা বেঁকে বসলেন - আমরা মুখার্জ্জী ওরা দত্ত, কিছুতেই নাকি এ বিয়ে হতে পারে না। কত করে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, কাজ হল না। মায়ের অমতে অনীতাও বিয়ে করতে রাজী হল না। বললো - 'যে বাড়ীতে বৌকে আদর করে না নেয় সেখানে সে যাবে না, আর মায়ের মনে কষ্ট দিলে ছেলেবৌই বা সুখী হবে কি করে'? অগত্যা মায়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিয়ে না করেই আমি বিদেশে রওনা হলাম।

পড়াশুনো ও কাজের চাপে এক এক করে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। তার মধ্যে বেলার বিয়ে হয়েছে, মাবাবা কলকাতা ছেড়ে দেওঘরে চলে গেছেন। বেলার চিঠিতে অনীতার বিয়ের খবরও পেয়েছি। সে মুখার্জ্জী বাড়ীর বৌ হতে পারেনি, বোস বাড়ীর বৌ হয়েছে। বোস কথাটা মনে দাগ কেটে আছে ওর স্বামীর নাম মনে নেই।

মাথায় কি পাগলামী চাপলো হোটেলে ফোন করে 'মিসেস বোসকে' চাইলাম। ফোন বাজলো দেখলাম মেয়েটি ঘরে গেলো, ফোনে শুনলাম 'হ্যালো', জিজ্ঞাসা করলাম 'আপনার নাম কি অনীতা? বাবার নাম সুধাময় দত্ত? পাকপাড়ায় বাড়ী ছিল?' সব কটার উত্তরই হ্যাঁ হল, বুকের মধ্যে আমার হাতুড়ী পিটছে। ২৫ বছর আগে দেশ ছেড়েছি সেই শেষ দেখা অনীতার সংগে। আমার সামনের হোটেলে সত্যিই সেই অনীতা? ওদিক থেকে প্রশ্ন হল আমার তো সব পরিচয় নিলেন আপনার নিজের পরিচয় তো দিলেন না? বললাম অনেক বছর আগে যাকে চিন্‌তে আমি তোমার বন্ধু বেলার দাদা তপন মুখার্জ্জী। কিছুক্ষণ ওদিকের কোন শব্দ নেই, বুঝলাম ওর বুকে হাতুড়ীর ঘা পড়ছে। বললো - "তুমি তো জার্ম্মাণী ছিলে, এখানে কবে এলে? আমার ফোন নম্বরই বা পেলে কি করে? সবে তো গতকাল আমরা এখানে এসেছি, কাউকেই তো এখানে চিনি না?" উত্তরে বললাম যা দিনের পর দিন দেখেছি তোমার ঐ বিশেষভঙ্গীতে বারান্দায় দাঁড়ানো। আজ একটু আগে যখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলে - মনে হল 'চিনি গো চিনি তোমারে' - মনে পড়লো তুমি বোস-বাড়ীর বৌ হয়েছো, মুখার্জ্জীবাড়ী তোমায় আদর করে বৌ করে নিতে পারেনি। তাই ফোনে 'মিসেস বোসকে' চাইলাম - আর পেলাম তোমার সাড়া। এখন ইচ্ছে করছে তোমায় কাছ থেকে দেখি। যদি আপত্তি না থাকে দুপুরে লাঞ্চের সময় যেতে পারি। ও বললো এসো তবে উনি থাকবেন না, ওঁর ফিরতে বিকেল হবে। বললাম তাহলে বিকেলেই যাবো। অনীতা বললো না দুপুরেই এসো, আবার বিকেলে তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এসো আমাদের সংগে রাত্রে খাওয়াদাওয়া করবে। বললাম - আগে দুপুরে তো আসি - তোমার স্বামী রাগ করবেন না তো? ও বললো - না রাগ করবেন কেন? তুমি সাড়ে এগারোটায় ফোন করো আমি তৈরী থাকবো।

ফোন ছেড়ে দিয়ে অতীতে ডুব দিলো অনীতা। মনটা ছটফট করছে, কিছুতেই মন বসাতে পারছে না। তবু জোর করে চান সেরে রাত্তিরের রান্নার কাজ কিছু এগিয়ে রাখতে গেলো। ইতিমধ্যে ওর স্বামী দেবাশীষ ফোন করলো। অনীতা সকালের সব ঘটনা বলে লাঞ্চে তপনের সংগে যাবে না যাবে না সেই দ্বন্দের সমাধান চাইলো স্বামীর কাছে।

দেবাশীষ বললো তুমি তো আচ্ছা মানুষ, এতদিন পরে এত কাণ্ড করে ভদ্রলোক তোমায় খুঁজে পেয়েছেন, দেখা করতে চাইছেন, আর তুমি দোনামোনা করছো? নিশ্চয়ই যাবে। বিকেলে আমাদের সংগে ওঁদের খেতে বলে ভালই করেছো, কিন্তু কি রাঁধবে? অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারের অবস্থা তো বিশেষ ভাল বলে মনে হয় না, রান্না না করতে পারো বাইরে কোথাও যাওয়া যাবে।

অনীতা - না বাবা কাল রাত্রে ভাল করে খাওয়া হয়নি, আমি ডালভাত যা হয় তাই রাঁধবো, আমি তো বাড়ী বসে রান্না করে খাওয়াচ্ছি না যে অনেককিছু করতে হবে, ওঁরা সেটা বুঝবেন। তুমি কখন ফিরবে? পাঁচটায়?

দেবাশীষ - ঠিক বলতে পারছি না, আগেও হতে পারে।

অনীতা - আমি ফিরে এসে তোমায় ফোন করবো।

সাড়ে এগারোটায় ফোন করে তপন এলো অনীতাদের দরজায়। দরজা খুলে দুজনে দুজনকে দেখতে লাগলো। অনীতা ভাবছে সত্যি তপন দাঁড়িয়ে ওর সামনে। ফুটবল খেলতে গিয়ে মাথায় যে চোট লেগেছিলো, সেই কপালে দাগটা রয়েছে, মোটা হয়েছে খানিকটা। অনীতাও মোটা হয়েছে। দুজনের মুখে কথা নেই। তপনই প্রথম কথা বললো - শাড়ীটা সুন্দর মানিয়েছে তোমায়।

অনীতা - ভিতরে এসো, চাঁপা রং তোমার পছন্দ ছিলো তাই এই শাড়ী পরেছি। এতদিনের কথা অনীতা মনে রেখেছে বলে তপনের ভাল লাগলো।

তপন - ভিতরে যাব না, চলো কাছেই একটা রেষ্টুরেন্টে যাই।

রেষ্টুরেন্টে দুজনে মুখোমুখি বসল, কত কথা বলার আছে শোনার আছে - কথা বলে চলেছে দুজনে - সময় বড্ড কম। অনীতা জানলো তপন একাই আসবে, কারণ ও বিয়ে করেনি।

তপন - তোমার মত আর একজনকে পাইনি তাই বিয়ে করা হয়নি। অনীতার মনটা খারাপ হ'ল, একজন তার কথা ভেবে বিয়ে না করে আছে।

অনীতা - আমি তোমার জন্য ভাল মেয়ে দেখে দেবো।

তপন - কেন, আমি সাতপাকে বাঁধা না পড়ে সুখে আছি তা সহ্য হচ্ছে না বুঝি? বিয়ে করলে অন্যের বৌকে ফোন করে লাঞ্চ খেতে নিয়ে যাচ্ছি শুনলে বৌ পেটাতো।

অনীতা - আমার স্বামী কি আমায় পেটাবেন?

তপন - ছেলেদের মন উদার, তাদের কথা আলাদা।

অনীতা - দেখাচ্ছি মজা, মেয়েরাই যত খারাপ, সেইজন্যেই তোমার বৌ জোটেনি।

তপন হাসতে হাসতে - না রাগ করো না, তুমি ঠিক আগের মতই আছো। ঠাট্টা করছিলাম। আসলে মনের মত মেয়ে জুটলো না। মনটা তো একজনকেই চেনে, তার সংগে তুলনা করে মেলাতে গিয়ে মিললো না, আর সময়ও হল না। আর

এই বয়সে নতুন একজনকে নিয়ে নতুন জীবন সুরু করার সাধ নেই। কথায় কথায় অনেকটা সময় চলে গেছে। ওরা হোটেলে ফিরে এলো। অনীতাকে পৌঁছে দিয়ে, আবার ছটার সময় অনীতার স্বামীর সংগে দেখা করতে আসবে বলে গেলো তপন। অনীতা ফিরে এসে দেবাশীষকে ফোনে সব কথা জানালো।

ঠিক ছটার সময় বেল বাজলো, অনীতা ও দেবাশীষ দুজনেই গেলো দরজা খুলতে। অনীতা দরজা খুলে আলাপ করিয়ে দিলো। দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে।

তপন - তুই দেওঘরের দেবু না?

দেবাশীষ - তপু তুই?

অনীতা দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে হতভম্ব।

দেবাশীষ - তোর স্মরণশক্তি অসাধারণ। আমার এই নধরকান্তি দেহ আর টাক পড়া মাথা দেখেও এতদিন বাদে চিন্‌তে পারলি? অবশ্য তোর পক্ষে সবই সম্ভব। ২৫ বছর আগে দেখা বান্ধবীকে রাস্তার ওপারের জানলা দিয়ে দেখে যে চিন্‌তে পারে তাকে বলিহারি দিতে হয়।

ওরা দুজনে দেওঘরে স্কুলে এক সংগে পড়েছে - ফার্স্ট বয়, সেকেণ্ড বয়। তপু শেষ পরীক্ষায়ও প্রথম হয়েছিলো।

তপন - বিয়ের পরীক্ষায় তুই আমায় ভীষণভাবে হারিয়েছিস। প্রথম তো বটেই, একেবারে লক্ষ্মীশ্রীলাভ, আর আমি একদম যাকে বলে ফেল।

অনীতা ভাবছে এই তপু যার কথা কতবার শুনেছে, যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছে বলে দুঃখ করেছে দেবাশীষ। কোথায় দেওঘর তপনদের বাড়ী সেখানে স্কুলে পড়া তারপর পাকপাড়ায় থাকা অনীতার সংগে আলাপ।

আর আজ কানাডায় দুই বন্ধুর হঠাৎ দেখা।

GANESHA - OR WHY I WANTED TO BE THE LION

Amitava Sen

Another Durga Puja came and went. It wasn't the same as before. It wasn't fun. We missed the busy days of rehearsals, music, dance, and plays that used to fill up all our weekends for two months every year. That was two years back - we lived then in Hyderabad, and our family being very active in the local Bengali cultural activities, especially the annual Durga Puja, we had our house full of friends and acquaintances planning and rehearsing for the festival. We also had artisans coming over from Calcutta to create the big Durga "protima" from clay. That happened every year, as long as I could remember - for we moved to Hyderabad when I was just a year and a half. The last time I also helped in creating the idols out of clay - I remember especially the fun I had with Ganesha's head! After the clay dried, it was time to paint - and the whole family joined in. Under the direction of the artisan we would paint the background or the dresses - he usually kept the faces to himself. That was his professional expertise.

Now that we were in Bhubaneswar, in Orissa, we missed all that - the Bengali community here wasn't that interested in celebrating the puja with such vigor. Of course, there were pujas - a lot more of them than in Hyderabad - but it wasn't the same. Later, when we moved to Calcutta, we saw many more pujas - but again, how could they replace those feelings of festivity like in my childhood days in Hyderabad? We were not involved - just a part of the huge mass of spectators that throng to see each neighborhood club trying to outdo the adjacent one in size and decoration of "pandels".

But, I'm jumping ahead. Right now, my heart sank at the idea of moving once again - from Bhubaneswar to Calcutta. Another new school, another whole set of friends. Another saying goodbye to my playmates - jotting down addresses, and promises to write (that were never kept). For weeks we were packing up all our belongings, packing up the whole set of twenty-two big boxes that seemed to have been unpacked just the other day. Such was life! For my father was the perpetual nomad of India - a Central Government transferable employee. There is hardly a corner of India he hasn't lived in - from the hills of Assam to the shores of the Arabian Sea, from the Himalayas to Kanya Kumari. He has dwelled in all kinds

of dwellings - from humble huts, tents, inns, hotels, bungalows, to huge palaces of the maharajahs - that was his life. For he travelled often to camp sites, being a geologist - and we kids usually had to stay home to attend school. But then when he was transferred to another state - that's when we all had to move. It was not possible in India to live in another city from one's own family, and commute - as in the United States. So the family moved, and lately, it seemed too often.

In the evening, after returning home from my last enjoyable game of cricket, I was in a very gloomy mood. My father said, "Before we move to Calcutta - this weekend I have my last camp trip coming up in Orissa, for one week. How about going there all together?" "Where?" asked all of us. "In the jungles of Simlipal." That's exactly what we needed - a break from the tiresome packing, an outing in the wilderness. Simlipal hills in upper Orissa are almost totally untouched forest land (or it used to be then!) and we made plans to stay at several places - the guest house of the rajah of Mymensingh, the forest bungalow at Gudgudia, to tents at other remote places. My eldest sister and my little nephew had come from Hyderabad, and we were looking forward to an enjoyable week, with the whole family.

We drove in my father's office station wagon. Slowly the populated cities receded from small towns, villages, smaller settlements, to unpopulated countryside. Then we saw the hills in the horizon. They looked completely green, lush with untouched forest. My father said, "There are places in there where no civilized man has dared to go." "Why?" "Cannibals." It was exciting! Shall we see them? This was the best vacation yet!

It was getting dark. The first night's stay was planned at the bungalow of Gudgudia, still about fifty miles into the forest. The trees were so close to each other, there was hardly any light reaching us from the setting sun. The wagon's headlight flashed on endless thick undergrowth, as we kept twisting and turning up and down the hilly, unpaved road. Behind us, the red tail lights just showed a thick cloud of dust. Suddenly the wagon stopped. I was just musing about what adventures lay ahead. Suddenly I was jerked to the present. I didn't know why we stopped. Or why the driver just turned off the engine, and folded his hands as if in prayer to some unseen God in front of him. I asked him, "What's the matter? Did we break down?"

"Ganesha!"

He spoke just that word - and pointed straight into the dark. We all looked.

There was something moving. We still couldn't see very well, as the headlights had also been turned off by the driver. Then, as my eyes became accustomed to the dark, I saw. A tangle of swaying trunks. A herd of about ten or eleven elephants were swaying in the dark, in a little clearing just fifty yards from us. One large elephant was uprooting a tree trunk, and stood smack in the middle of the dusty road. We just stayed there helplessly, as the elephants took their own sweet time to move away, completely oblivious of us.

I guess it was actually just fifteen or twenty minutes of waiting, though it seemed longer than a couple of hours. It didn't take long after that to reach our destination. We had a splendid dinner at the bungalow, with freshly killed wild fowl, and got ready for bed. The geologist's camp was just adjacent to the bungalow, within about a hundred yards, and we saw the bunch of white canvas tents glowing in the dark. But we decided to go and visit them next morning. I was getting sleepy, and it must have been about eleven or half-past, when suddenly there was a loud knock at the door.

I got up to see what the commotion was about, as my father opened the door and in rushed twelve young men. These were the geologists from the camp. What was the matter? They seemed all out of breath. Then I heard the trumpet call. It blared through the still night air, like the war cry of some giant warrior. A herd of elephants again. This time, right in our backyard.

Well, as you can imagine, we hardly slept that night. And as if to keep us from sleeping, each young man started narrating his own wildest elephant story. It seemed quite common in these parts to see a trunk suddenly appear in your tent, searching for something edible, or just "sniff-able." Or the "out-house" tent suddenly rock - as if by an earthquake, as you sat there alone in the night - and you would sit there shivering, helpless, wondering when your wild Ganesha will have mercy, and leave your company.

Next morning, as all seemed clear and calm, we went out to explore. There were heaps of manure as giant as you can imagine - just like big green rocks all over the yard. We visited the nearby village, and saw some of the huts were completely broken down, or the roof punched through. It was just like a cyclone - but the devastation this time was not nature's, but Ganesha's. That's what the simple village people believed. They prayed to their wild Ganesha, even offered him food, just to keep him from devastating their property. But Ganesha didn't always seem satisfied.

Maybe it was their fate, or some sin they committed last night. In reality, it was discovered later that a young elephant cub had fallen into a man-made trap (for other wild beasts like cheetahs and tigers, as they were also quite visible in these parts). The mother couldn't get her out, and went off raving mad. The others came, and together the herd must have succeeded in rescuing their protégé. We saw the trap, and the signs of the rescue effort.

Then, a simple old village lady came to mother, and said to the other village folk, "Look! Ma Durga has come!" We were compared to the divine family, as we were also two sisters and two brothers - and I was "Ganesha."

Since then "Ganesha" conjures up in my mind the images of the wild elephants I met in Simlipal. I liked being compared to Ganesha - isn't he supposed to be wise, and powerful over the fate of humans? Doesn't matter if he isn't as handsome as Kartick - he looks cute with his pot belly and elephant trunk. Then, the other day I was reading stories of "Mahabharata" to my daughter, when it occurred to me - in some ways I have been Ganesha for a long time. Just like Ganesha - the scribe who wrote down the great epic as it was recited by Vyasdev - I have been writing down pages after pages of other people's thoughts on my Bengali-writing word processor. It is time for a change. This time, I'll create my own action. No more Ganesha. I'll be the lion instead!

Collage by Suzanne & Amitava Sen

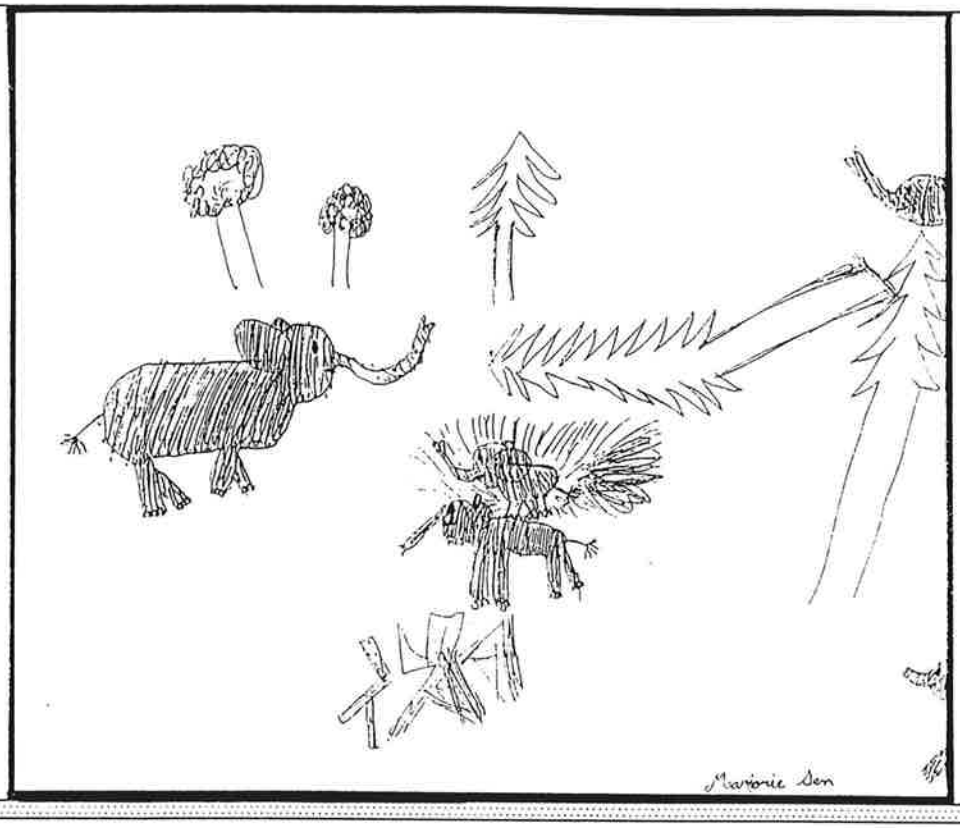

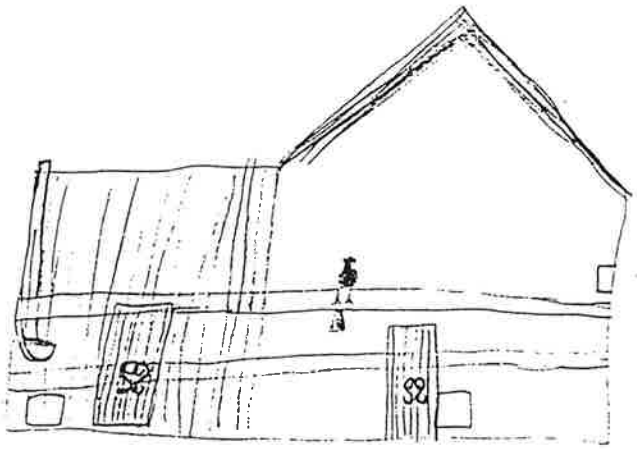

Le Jour de Sarah

C'est le jour de Sarah, son anniversaire.
Elle a reçu beaucoup de cadeaux.
Le plus bruyant, le cadeau de sa mère,
Le second préféré, c'était un oiseau.

Marjorie Sen

THE MAGIC KEY

Atasi Das

Hi, my name is Rachel. I live in a city called Raman. It is where the oriental king lives. His name is Majan. I heard that the king lost a very special key. To the person who finds and returns it, the king will give a special prize. So everybody was out of their house and on the street. But there was a catch - if they could not find the key within the deadline they would be killed. So I went along. Wait, hold on, I think I found something. It's a key! Let's see if it is the right one! It says "ozathmftlzop". What does that suppose to mean? It might mean a special code. Or, it might be the spare key I lost. Let me try it on my door. Ok, here I go. What happened to my room? It is a palace! I'll take the key out. Oh good! It's my old room again. This is not the ordinary key to my room. I will go to the king and see if it is his.

"Your highness, do you think this is the missing key?"
The king said, "Does it say 'ozathmftlzop'?"
"Yes, it does."
"Did you put it in your room door and unlock it?"
"Yes, I did."
"Well, did your room turn into a palace?"
"Yes, it did."
"Well, then it is mine. And you get the special prize."
"What is it?"
"Well, you get to live in a mansion."
"Can I see the mansion today?"
"Yes you can, but on one condition. You have to take the hundred keys out of the mansion."
"Ok, where is it?"
"It is in your hand. This key will turn your room into a mansion where you can live happily ever after."

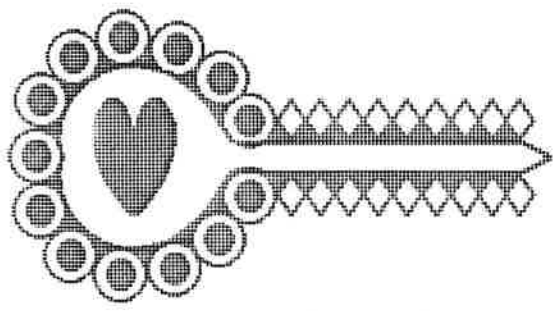

JANUARY

Anirban Das

January is the time for laughter and cheer,
For the time is come for the new year.
On New Years Day we drink and drink,
'Til our eyes are blue and our hearts are pink.
As the year rolls in, so does the chill,
The cold winds whip and voices begin to shrill.
The leaves have fallen and the birds have left,
But we still have college football to see who's the best.
The sun dimmed and darkened its light,
So now there's less day and a lot more night.
As the month rolls on there's more we can see,
Like the Super Bowl and the infamous Bud Bowl III.
January is the time for laughter and cheer,
I can't wait 'til the next year.

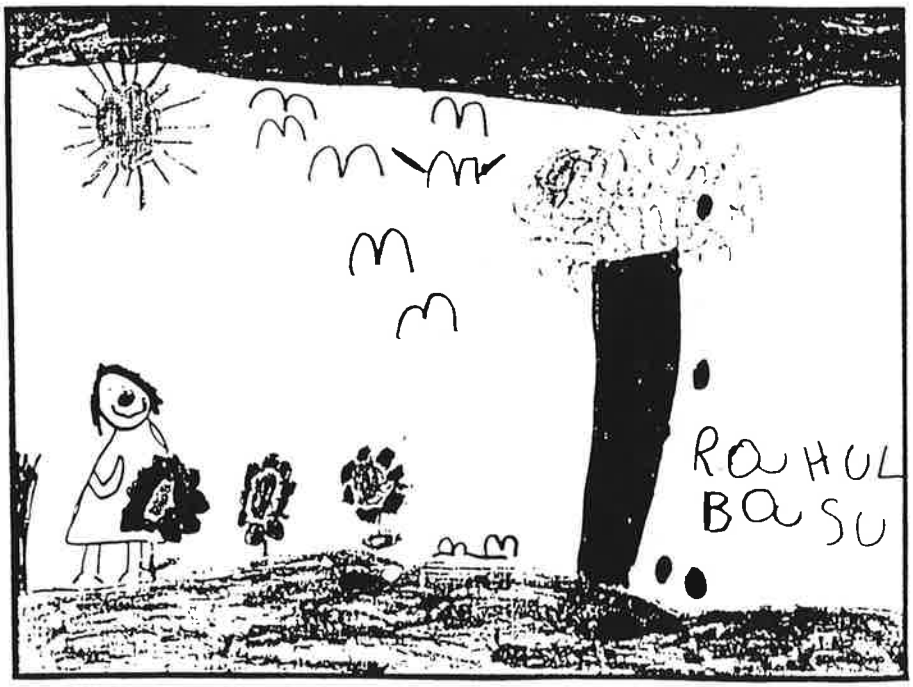

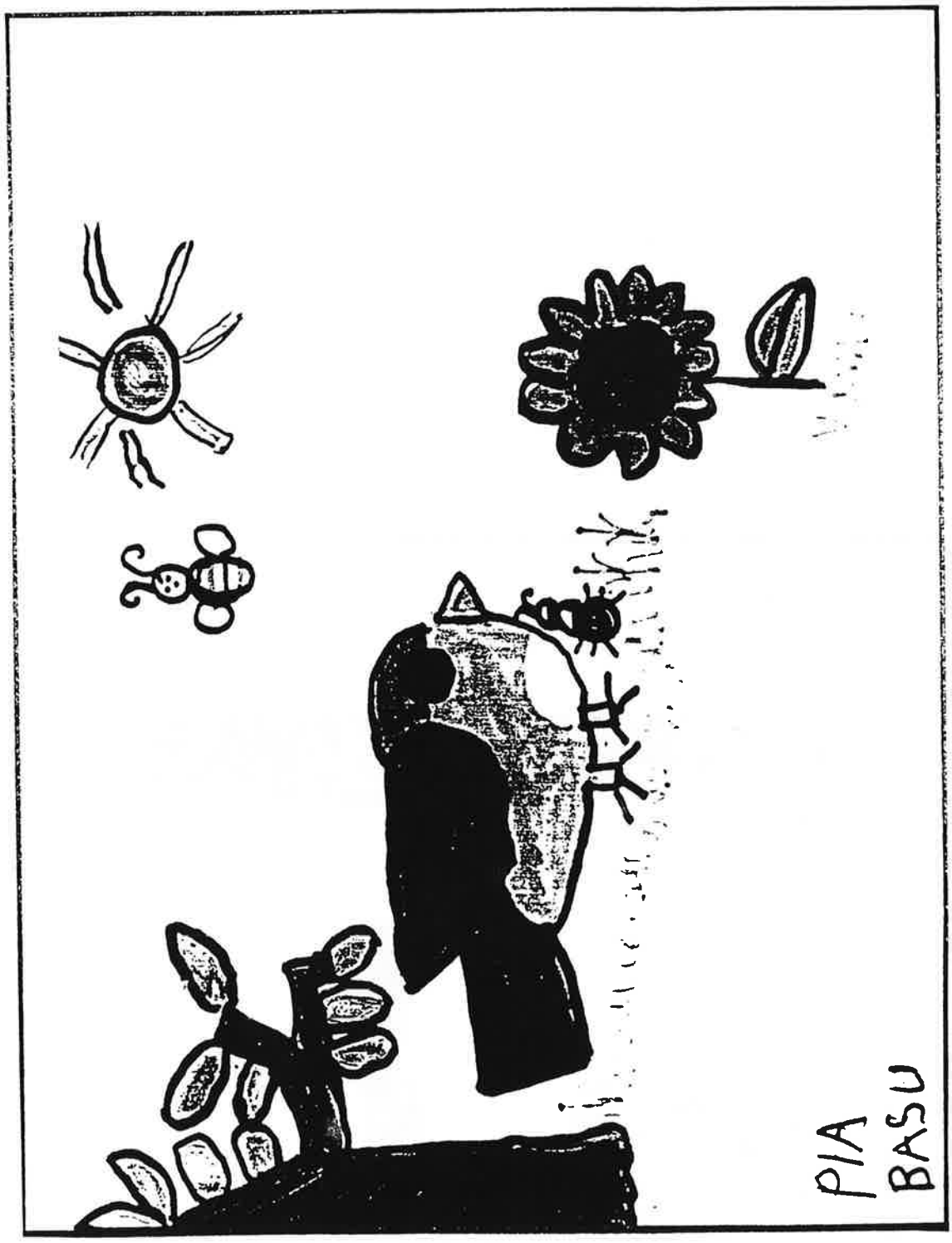
PIA
BASU

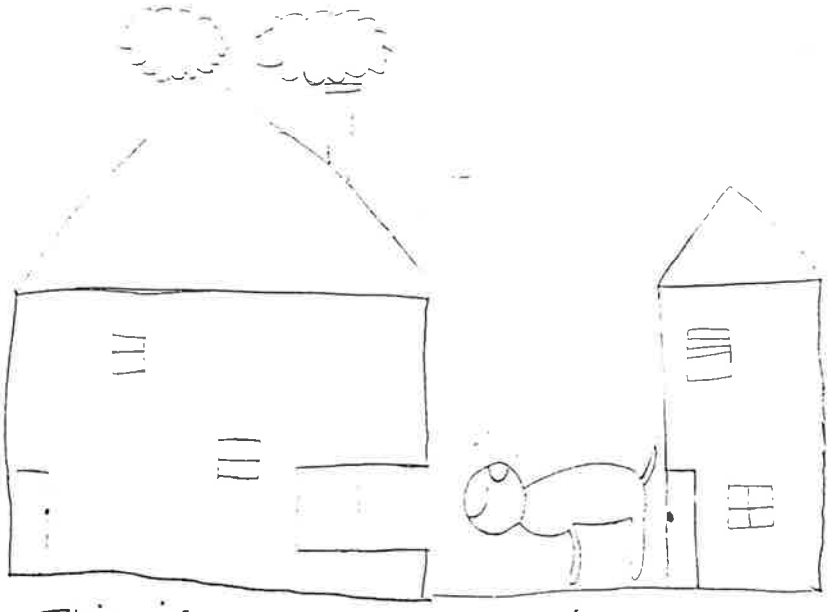

This is MY House This is MY Dog

Beautiful Deer

This is me
Priyanka Mahalanabis

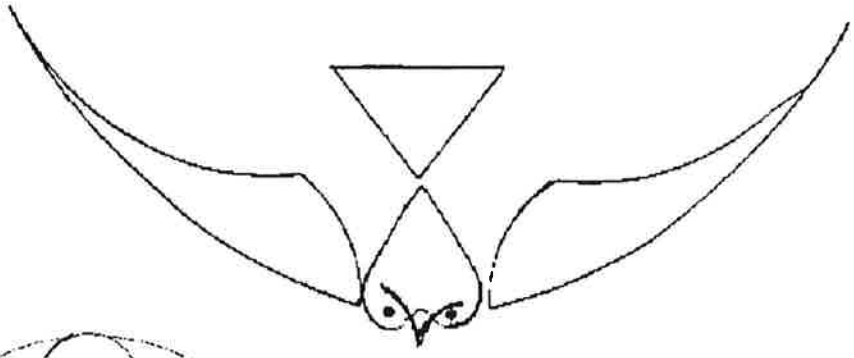

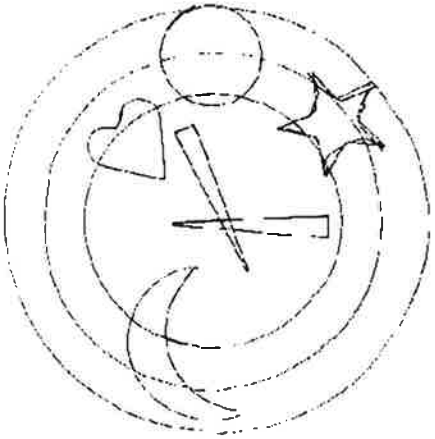

A PRAYER

Sandip Mitra

Oh Lord, thank you for the plant and
for the trees, people, animals and sun,
and thank you for the food and water,
oh Lord, and thank you for universe.

Let us worship you in the goodness.
Let's have peace on earth.
Let's all get along.
Oh Lord, in the past was evil.

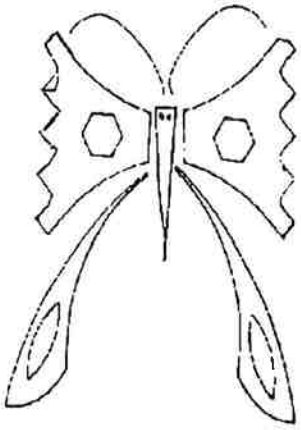

Symbol of faith:
Oh Lord, let's have a temple and think of the future of India. Oh Lord, let's raise money to help the homeless and people we're losing, and show us the path and promise of the new day.
Oh Lord, let's all play in the number and let saints march in and
let's raise money to repair the phone and housing and schooling, health,
and repair the road, clean air,
and put all the grandparents.
Oh Lord, God is watching us.

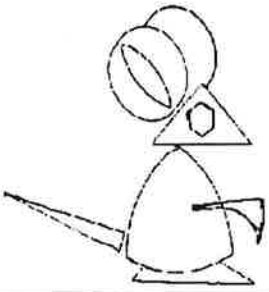

Art: Mimi Sarkar

Entertainment Program - October 12, 1991 - 4:30 PM

1. Dance Drama 'Mahishamardini' -	artists of Atlanta
2. Recitation -	Priyanka Mahalanobis, Atlanta
3. Harmonica -	Shyamal Mukherjee, Greenville, SC
4. Folk Dance of Bengal -	artists of Augusta, GA
5. Rabindrasangeet -	Monideepa Bhattacharya, Atlanta
6. Slide Show 'Temples of India' -	Ranés Chakravorty, Salem, VA
7. Vocal -	Indrani Ganguly, Martinez, GA
8. Bharatnatyam -	Kakali Paul, Augusta, GA
9. Vocal -	Nilanjana Banerji, Chatanooga, TN
10. Instrumental -	Amitava Sen, Atlanta
11. Vocal -	Asok Basu, Atlanta

i n t e r m i s s i o n

12. Play 'Kanchanranga' -	artists of Atlanta

MAHISHAMARDINI - Dance Drama

Dance: Rajashri Banerjee, Reshma Gupta, Atasi Das, Sutapa Das, Susmita Mahalanobis, Marjorie Sen, Priyanka Mahalanobis, Jaydip Mukherji, Rupak Das, Anita Banerji, Sonya Banerji, Amitava Sen

Choreography: Shyamoli Das, Kalpana Das

Music: Jayanti Lahiri, Mamata Basu, Asok Basu, Maya Mukherji, Somnath Misra, Swati Bhattacharya, Amitava Sen

Narration: Pranab Lahiri

Costume: Rekha Mitra, Kalpana Das, Shyamoli Das, Sutapa Das

KANCHANRANGA

(Abridged from the play
'Kanchanranga' by Sombhu Mitra)

"Kanchan" means treasure and "Ranga" means satire: this is a satire about attitudes of a middle class family coming into close encounters with new-found wealth.

Panchu, a distant relative, has been brought to Calcutta by Jadugopal and his wife from their village, ostensibly to help him settle down. However, for all practical purposes, he has been relegated to the duties of an unpaid and much-maligned house servant. Neither the middle-aged couple nor their unemployed sons Amar and Samar, or their college-going daughter Shima, have anything but contempt for Panchu. The only person who treats him as a human being is Tarala, the maid - who in fact has a soft corner for him.

Panchu has been given a lottery ticket by Batu, who lives upstairs. As luck would have it, the ticket wins a grand prize. Attitudes immediately change towards Panchu. Each member of the family treats him very well in the hope of extracting his/her own benefit. Panchu's own ego also gets a big boost. Through all this, Tarala's feelings for Panchu remain unwaivering. Later, it transpires that Panchu has missed the grand prize just by one digit in the ticket number. Immediately his treatment by the family changes; he is about to be thrown out of the house when a telegram arrives to announce that Panchu has in fact received the grand prize! Panchu, in the meantime, has assessed his own true worth. He reciprocates Tarala's true love for him by handing over his winning ticket to Tarala, and goes away with her.

CAST

Panchu:	Amitava Sen
Tarala:	Shyamoli Das
Jadugopal:	Samar Mitra
His wife:	Kalpana Das
Amar:	M.H.Akmal
Samar:	Saumya Kanti Das
Shima:	Sutapa Das
Tenant's wife:	Shanta Gupta
Batu, her brother:	Somnath Misra
Elderly person:	Pranab Lahiri
Film Director:	Swapan Bhattacharya
Narrators:	Swapan Bhattacharya Bula Gupta
Direction:	Jayanti Lahiri
Sound:	Amitava Sen, Kiriti Gupta
Lighting:	P.K.Das
Decoration:	Shyamoli Das, Achira Bhattacharya, Sutapa Das
Costume:	Kalpana Das

SPECIAL THANKS TO:

Food:
Nila Akmal
Mamata Banerjee
Raksha Banerji
Mamata Basu
Parna Bhattacharya
Sibani Chakravorty
Bijan Prasun Das
Kalpana Das
Priya Kumar Das
Shyamoli Das
Sutapa Das
Bula Gupta
Jayanti Lahiri
Susmita Mahalanobis
Rekha Mitra
Pran Paul
Krishna Sen Gupta

Decoration:
Achira Bhattacharya
Shyamoli Das
Sutapa Das

Brochure:
Amitava Sen
Asok Basu
Jayanti Lahiri
Samar Mitra
Suzanne Sen
and all the contributors

Invitation Letter:
Amitava Sen

সে যুগে

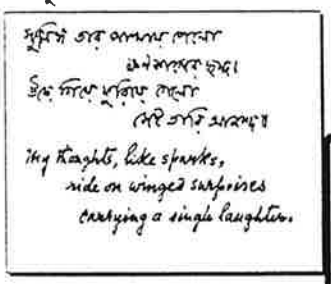

আজকাল

আপনার কল্পনাকে
সুস্পষ্ট ও সুন্দরভাবে
গুছিয়ে প্রকাশ করতে
"সম্পাদক"এর
সাহায্য নিন।
বাংলা লেখার
অভিনব পদ্ধতি -
IBM PC তে
ব্যবহারের জন্য
সফ্টওয়ার
এখন বিক্রি হচ্ছে।

Sampadak

Multilingual Word Processor

Software for IBM PC and compatibles.

Amitava Sen
1079 Berkeley Road
Avondale Estates, GA 30002
(404) 289-3425

PUJARI
Atlanta, Georgia
STATEMENT OF ACCOUNTS

1990 DURGA PUJA AND LAKSHMI PUJA

RECEIPTS		EXPENSES	
Balance from 1990 Saraswati Puja	$ 729.95	ICRC Hall Rental	$ 200.00
Donations	$2509.93	Saris for Pratimas	$ 35.00
Sale of remainders	$ 29.31	Prasad and food	$2019.61
		Decoration/program	$ 210.00
TOTAL RECEIPTS	$3269.19	Miscellaneous	$ 215.00
LESS EXPENSES -	$2679.61	TOTAL EXPENSES	$2679.61
BALANCE	$ 589.58		

1991 SARASWATI PUJA

RECEIPTS		EXPENSES	
Balance from 1990 Durga Puja	$ 589.58	ICRC Hall Rental	$ 100.00
Donations	$ 576.00	Prasad and food	$ 459.23
		Decorations	$ 50.00
TOTAL RECEIPTS	$1165.58	Miscellaneous	$ 47.00
LESS EXPENSES -	$ 656.23	TOTAL EXPENSES	$ 656.23
BALANCE	$ 509.35